

মাসিক

আল্‌ যুয়ুফান

যিলহজ ১৪৩৬ | আশ্বিন ১৪২২ | অক্টোবর ২০১৫



বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম
আল ইকুয়া ইসলামী পাঠাগার
বাই নং-.....ছিরিয়াল নং-.....
পরিচালক: এম.এ আজিজ

আল বুরকান

যিলহজ ১৪৩৬ | আশ্বিন ১৪২২ | অক্টোবর ২০১৫

- উপদেষ্টা সম্পাদক
আল্লামা শাইখ ইসমাইল হুসাইন আল-মাদানী
আল্লামা শাইখ সুলাইমান আল-উকাইলী
প্রফেসর ড. নাসরুল্লাহ আল-মানসূর
- সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
শাইখুল হাদীস আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা
- প্রধান সম্পাদক
ড. এবিএম সিদ্দীক
- সহ-সম্পাদক
ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল
- নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ তানভীর আহসান
- ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মু'তাসিম বিল্লাহ আল-মামুন
- শিল্প-সম্পাদক
কাজী বাশীর আহমাদ
- বিতরণ সম্পাদক
আহসান উল্লাহ মাহমুদ

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০ টাকা মাত্র



প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও

যেকোন প্রয়োজনে

alburqan2015@gmail.com

www.facebook.com/alburqan

সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক আল-বুরকান প্রেস আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।



বিন্যাস-সূচি

০৩	২৬
বিদ্বাত ও মুরতাদদের	লোহার শিকলে নয়
শারঈ হুকুম	আমার অস্তিত্ব
০৪	তোমাদের নির্মম লজ্জাহীনতায়
নিফাকের ফিতনা	৩০
আগের চেয়েও এখন	মোছা উমর
সক্রিয় মুনাফিকরা	জিহাদের সৌরভে সুরভিত
০৮	এক পুষ্প
মানবরচিত জীবনব্যবস্থার	৩৩
প্রতিটি ক্ষণই যেন	ইতিহাস ৯/১১
এক কালবেলা	এ শুরু হয়নি
০৯	৩৪
যিলহজ মাসের করণীয়	আপনার ধান্দা কী?
১২	৩৮
গণতন্ত্র, না ইসলাম?	পাত্রী চাই!
একটা বেছে নাও	৪১
১৫	ঈদের করণীয় ও
আমাদের ও ওদের ঈদ	বর্জনীয় দিকসমূহ
১৭	৪৫
আমার সন্তাসী হয়ে উঠার	ছড়া কবিতা
গল্প	৪৬
২২	প্রশ্নোত্তর
কুরবানির	
উদ্দেশ্য ও শিক্ষা	

রিদ্বাত ও মুরতাদদের শারঈ হুকুম



শাইখুল হাদীস আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তাফা

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَخْذَرُونَ - وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً بَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

অর্থ : মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলো জানিয়ে দেবে। বলো, তোমরা উপহাস করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে- আমরা তো আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম মাত্র। বলো, আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওয়র পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো। (কুরআন, ৯ : ৬৪-৬৬)

শানে নুযল :

পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু আয়াত বিশেষ ঘটনা অথবা বিশেষ প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে নাযিল হয়েছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বিধানের ব্যাপারে একটি সাধারণ উসূল হলো- 'নুযুলে আম, হুকুমে খাস।' অর্থাৎ যদিও নাযিল হয় বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু তাতে বর্ণিত বিষয়টি সর্বকালের সর্ব স্থানের সকল মানুষের

জন্য প্রযোজ্য। আমাদের আজকে আলোচ্য আয়াতটিও একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর যে সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো আয়াত নাযিল হয়, তাকে ঐ আয়াতের শানে নুযুল বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাদীস ও তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে-

আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় এক মজলিসে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বলল-
مَا أَرَى قَرَأْنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا أَرْغَبْنَا بِطُغْنَا،
وَكَذَبْنَا أَلْسِنَةً، وَأَجَبْنَا عِنْدَ الْفَقَاءِ

অর্থঃ আমাদের এই কুরআনওয়ালাদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটুক, এতটা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ মজলিসের এক (মুমিন) ব্যক্তি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি একটা মুনাফিক। আমি অবশ্যই তোমার এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব। পরবর্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাযিল হয়ে গেল।

তাহকীক :

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

'মুনাফিকরা ভয় করে' অর্থাৎ মুনাফিকরা সবসময় আতঙ্কিত থাকে। কখন যেন তারা ধরা পড়ে যায়। তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন প্রবাদ আছে- 'চোরের মনে পুলিশ পুলিশ!'

أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ

'তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা

অবতীর্ণ হবে।' অর্থাৎ তাদের অবস্থা বর্ণনা করে কোনো সূরা নাযিল হয়ে যায় কিনা, যার মাধ্যমে তাদের গোপন চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে তারা অপমানিত হয়ে পড়বে।

تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

'যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলো জানিয়ে দেবে।' অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে অথবা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লুকায়িত আছে।

قُلِ اسْتَغْفِرُوا

'বলো- তোমরা উপহাস করতে থাকো।' এখানে তাদের ধমক দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَخْذَرُونَ

'নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছো।' অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের মুনাফিকি আল্লাহ (সুব.) সকল মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবেন।

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

'আমরাতো আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম মাত্র।' এটাই মুনাফিকদের চরিত্র যখন তারা ধরা পড়ে কিংবা তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পেয়ে যায় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা তাল্লাশ করতে থাকে।

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
'বলো, আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' অর্থাৎ তোমরা বিদ্রূপ করার আর কোনো জিনিস খুঁজে পেলে না। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াতকেই খুঁজে পেলে তামাশা ও বিদ্রূপ করার জন্য।

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

‘তোমরা ওয়র পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো।’ অর্থাৎ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে কোন প্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করলে সে মুসলিম থাকে না। বরং সে মুরতাদ হয়ে যায়।

আয়াতের শিক্ষা :

ক. মুনাফিকদের মনের অবস্থা কীরূপ তা জানা গেল। তারা সবসময় দুর্বল থাকে। তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পেয়ে যায় কিনা সেই আতঙ্কে থাকে।

খ. আল্লাহ (সুব.) মুনাফিকদের অবস্থা প্রকাশ করে দেন। যেমন এই আয়াতে বলা হলো। অপর আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

‘যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন না? (কুরআন, ৪৭ : ২৯)

গ. যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা যতই ঈমানের দাবি করুক না কেন মূলত তারা কাফের ও মুরতাদ। অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, কাউকে নাস্তিক বলা ঠিক নয়। কে নাস্তিক কে আস্তিক তা আল্লাহ জানেন। আপনি বলার কে? ইত্যাদি। তাদের কথা শুনলে মনে হয় যেন তারা খুবই আল্লাহওয়ালা। কিন্তু বাস্তবে এটিও মুনাফিকদের চরিত্র। কেননা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর বিধান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অন্যান্য সাধারণ গোনাহের মত নয়। সাধারণত কোনো গোনাহের কাজ করলে তাকে গোনাহগার, পাপী বা ফাসেক বলা হয়। কিন্তু কিছু গোনাহ এমন আছে, যে গোনাহগুলো করলে মানুষের ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে লোকটি কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয়। যেগুলোকে ‘নাওয়াকিয়ুল ঈমান’ বা ঈমান ভঙ্গের কারণ বলা হয়। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর আয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলিমদের নামায ভঙ্গের কারণ

হয়তো কিছু জানা আছে, অযু ভঙ্গের কারণ হয়তো কিছু জানা আছে, রোযা ভঙ্গের কারণও হয়তো কিছু জানা আছে; কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অথচ ঈমান আনার পূর্বেই এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আর এ জরুরি শর্তটি না জানার কারণেই তারা উপরোক্ত কথাগুলো বলে থাকে। আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন। ঘ. মুরতাদদের কোনো ওয়র-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা আল্লাহর বিধান বা রাসূল (সা.)-কে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা আর মুসলিম থাকে না বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। আর ইসলাম ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে মুরতাদ হয়ে গেল, তাকে তোমরা কতল করো।’ (বুখারি: ৩০১৭, ৬৯২২; আবু দাউদ: ৪৩৫৩, তিরমিযি, ১৪৫৮)

প্রথমত দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা আল্লাহর রাসূলের কটুক্তিকারীদের কতলের এ বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু প্রশাসন যদি এ দায়িত্ব পালন না করে কিংবা প্রশাসন নিজেই যদি হয় এসব কর্মকাণ্ডের মূল

রাসূলুল্লাহ (সা.)

ইরশাদ করেছেন, যে মুরতাদ হয়ে গেল, তাকে তোমরা কতল করো।’ (বুখারি:

৩০১৭, ৬৯২২; আবু দাউদ: ৪৩৫৩, তিরমিযি, ১৪৫৮)

হোতা, তখন ঈমানদার মুমিনরাই ব্যক্তিগতভাবে এ মহান দায়িত্ব পালন করবে। এমনকি তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে কোনো পস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে। নবীপ্রেমিক অন্ধ সাহাবির ঈমানদীপ্ত ঘটনাটি দেখুন—

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّجَّامِ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدَ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَتَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمُغُولُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ « أَتَشُدُّ اللَّهُ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ ». فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلَّزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَانْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمُغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَلَا أَشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَذَرٌ ».

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন অন্ধ সাহাবির একটা উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) দাসী ছিল। ঐ দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন ও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না।

এক রাতে দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতে লাগলো। তখন লোকটি একটি কোদাল দিয়ে তার পেটে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যা করলো। এ অবস্থায় তার (গর্ভস্থ) সন্তান তার দু'পায়ের মাঝখানে এসে পড়ল এবং রক্তে ভিজে গেল। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিষয়টি জানানো হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের জড়ো করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে সে যেন অবশ্যই দাঁড়ায়। তার প্রতি আমারও একটি হক রয়েছে। তখন অন্ধ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে মানুষের কাতার ভেদ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে বসে পড়ল। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ঘটনার ব্যক্তিটি আমি। আমার দাসীটি আপনাকে গালি-গালাজ করতো এবং অযথা তর্কে লিপ্ত হতো। আমি তাকে বারণ করলেও সে বারণ হতো না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দুটি সন্তান রয়েছে। তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গতরাতে সে যখন আপনাকে গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কুঠার নিয়ে তার পেটে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা সাক্ষি থাকো! তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হলো (তাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে না)।

(আবু দাউদ: ৪৩৬৩, সুনানে নাসাঈ: ৪০৭০, বুলুগুল মারাম: ১২০৪, আলবানি [রহ.] বলেন,

إسناده صحيح على شرط مسلم
ইমাম মুসলিমের শতানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। ইরওয়াউল গালীল- খ. ৫, পৃ. ৯২)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি করে তাদের রক্তের কোনো মূল্য নেই। তাদের যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেখানে সে অবস্থায় হত্যা করলে হত্যাকারীকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না।

আয়াতের শানে নুযুল হিসাবে যে হাদীসটি পেশ করা হয়েছে সে হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন-

رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبٍ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ
تَكْبُهُ الْحَاجِرَةُ

অর্থাৎ আমি দেখেছি ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উটের রশি ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
আমরা তো এসব শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন-

أَبَا اللَّهِ وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
'আল্লাহ, আল্লাহর বিধান এবং আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? (তোমাদের কোনো ক্ষমা নেই)' (তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম- খ. ৭, পৃ. ৩১৫)

উপরের হাদীসে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তি করেছিল তারা কোনো ইহুদি বা খৃস্টান ছিল না বরং তারা ছিল নামধারী মুনাফিক মুসলমান। যারা শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি করতো তাই নয় বরং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং যারা বর্তমানেও আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে কটাক্ষ করে- আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তারা কাফের ও মুরতাদ। তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে বিশ্বাস করা ও তা প্রচার করা প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না যে, কে কাফের কে মুসলমান তা আল্লাহ ভাল জানেন, আপনি নাস্তিক বলার কে? বরং এরকম প্রশ্ন ও আপত্তি যারা করে তারাও নাস্তিক মুরতাদদের সারিতেই গণ্য হবে। আল্লাহ (সুব.) আমাদের কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সত্যিকার মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

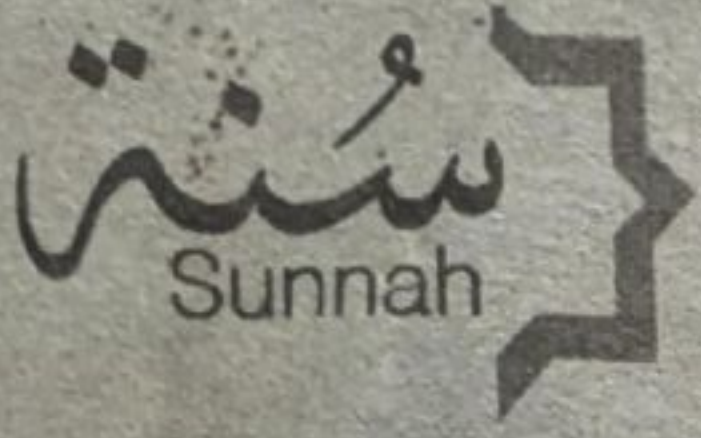
০৮ পৃষ্ঠার পর

শিশুদের হত্যা করবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম: ২/১৩৩)

বাংলাদেশে এখন মাতৃজঠরেও শিশু নিরাপদ নয়। অথচ ইসলাম এ ব্যাপারে কত সচেতন। একবার এক ব্যাভিচারী মহিলা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে নিজেকে গর্ভবতী উল্লেখ করলে তার গর্ভস্থ নিরপরাধ শিশুর নিরাপদ প্রসব এবং দুগ্ধপানের সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সা.) দন্ড কার্যকর করেননি। (সহীহ মুসলিম: ৪৫২৭, মিশকাত: ৩৫৬২, খ. ২, পৃ. ৩১০) ইসলামি রাষ্ট্র শিশুদের জন্য হবে স্বর্গ রাজ্য। আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তারা তাঁর সাথে রাস্তার ধুলোয় খেলতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের যত্ন নিতে বলেছেন। সকলের নিরাপত্তা আর অধিকারের ব্যাপারে শারঈ রাষ্ট্র কতটা দায়িত্বশীল তা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক খলীফা উমর (রা.) এর এ কথা থেকে বুঝা যায়- এই ফোঁরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরিও পা পিছলে পড়ে মারা যায়, আমি উমর ভয় করি যে, আল্লাহর কাছে আমাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

পুঁজিবাদী ভোগবাদী ব্যবস্থার কম্প্রসারের বিষবাল্পে ফুলে উঠা মৃতপ্রায় এই কুফরি সভ্যতার পতন ঘটিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে মানবতার মুক্তির দিশারী ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা। কায়ম হবে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। সর্ব দিকে, সপ্ত সুরে আজ কেবলই তার আগমনি ধ্বনি। আর এর জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শূহাদার সবুজ কাননে। আর এ কাজটি আমাদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব।

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি: ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, মুসলিম: ৪৮২৮, ইবনে হিব্বান: ৩৪২)



নিফাকের ফিতনা আগের চেয়েও এখন সক্রিয় মুনাফিকরা

শাইখ ইসমাঈল হুসাইন আল-মাদানী

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو
بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
وَأَصْلُ الْأَخْذِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ شَرِّهِمْ مِنْهُمْ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
كَانُوا يَوْمَئِذٍ يَكْتُمُونَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَجْهَرُونَ

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) হতে
বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্তমান যুগের
মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগের
মুনাফিকদের তুলনায় আরো বেশি
ভয়ঙ্কর। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে তারা
গোপনে কাজ করতো, আর বর্তমানে
তারা প্রকাশ্যে মুনাফিকি করে। (বুখারি:
৭১১৩, বাইহাকি সুনানে কুবরা:
১৭২৯৯)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-কে বলা
হয়, বিশ্বনবী (সা.) এর ইন্টেলিজেন্স।
তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে
অকল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, যেন সে
অকল্যাণ তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। এ
জন্যই ফিতনা সম্পর্কিত অধিকাংশ
হাদীসই তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য সাহাবিগণও ফিতনা সম্পর্কিত যে
কোনো ব্যাপারে তাঁর সাথে পরামর্শ
করতেন। মুনাফিকদের ব্যাপারে তিনি
অধিক জ্ঞাত ছিলেন। রাসূল (সা.) অনেক
মুনাফিকের নামও তাঁকে জানিয়েছিলেন।
হাদীসে এসেছে,

عن حذيفة قال: دعى عمر لجنارة
فخرج فيها أو يريد لها فتعلقت به فقلت
: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك
فقال: نشدتك بالله أنا منهم! قال: لا ولا
أبرئ أحدا بعدك

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
একবার উমর (রা.)-কে একটি জানাযায়
হাযির হতে দাওয়াত দেয়া হলে, তিনি
তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি
নিচ্ছিলেন অথবা বের হওয়ার ইচ্ছা
করছিলেন। আমি তার পিছু নিয়ে তাকে
বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি
বসুন। কারণ আপনি যে লোকের জানাযায়
যেতে চাচ্ছেন, সে ঐসব মুনাফিকদের
অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বললেন, আমি
তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি! তুমি
বলতো আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? আমি
বললাম, না। তবে আপনার পর আমি
আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা
করব না। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৪২২৫,
মুসনাদে বাযযার: ২৮৮৫)

শারহুল হাদীস :

নূন, ফা ও কাফ বর্ণগুলোর সমন্বয়ে গঠিত
শব্দটি অভিধানে দুটি মৌলিক ও বিশুদ্ধ
অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথম অর্থ দ্বারা কোন
কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া ও দূরীভূত হওয়াকে
বুঝায় আর দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা কোন কিছুকে
গোপন করা ও আড়াল করাকে বুঝায়।
নিফাক শব্দটি 'নাফাক' শব্দ হতে নির্গত।
'নাফাক' অর্থ- জমির অভ্যন্তরে বা
ভূ-গর্ভস্থ এমন গর্ত, যে গর্তে লুকানো
যায়, গোপন থাকা যায়। আর নিফাককে
নিফাক বলে নাম রাখা হয়েছে, কারণ
মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফরকে
লুকিয়ে রাখে বা গোপন করে। (লিসানুল
আরব- খ. ১০, পৃ. ৩৫৭; মুজামু
মাকায়িসুল লুগাহ- খ. ৫, পৃ. ৪৫৫)

মুনাফিকি বা কপটতা হলো এমন এক
কঠিন ব্যাধি, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ
ও মারাত্মক ক্ষতিকর। মুনাফিকি বা
কপটতা মানুষের অন্তরের জন্য এত
ক্ষতিকর যে, তা মানুষের অন্তরকে সম্পূর্ণ
নষ্ট করে দেয়, যার ফলে একজন মানুষ
দুনিয়াতে ঈমান হারা হয় এবং দুনিয়া
থেকে তাকে বেঈমান হয়ে চির বিদায়
নিতে হয়। মানুষের অন্তর নষ্ট করার জন্য
মুনাফিকি বা কপটতার চেয়ে মারাত্মক
ক্ষতিকর আর কোন কিছুই হতে পারে না।
একজন মানুষ কখনই মুনাফিকি বা
কপটতাকে পছন্দ করে না। কিন্তু
তারপরও তাকে তার অজান্তে মুনাফিকি
বা কপটতাতে আক্রান্ত হতে হয়।

এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ মুনাফিকি বা
কপটতাকে প্রতিহত করতে অক্ষম বা
মুনাফিকি হতে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য
অসম্ভব। যারা এটাকে হালকা করে দেখে
বা এথেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা
কম করে তারাই এতে আক্রান্ত হয়।
নিফাক মানুষের যাবতীয় ভাল ও
প্রশংসনীয় গুণকে ছিনিয়ে নেয় ও ঘণার
পাত্রে পরিণত করে। কুরআনুল হাকীমে
আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থা,
তাদের গুণ ও তাদের তৎপরতা তুলে ধরে
একটি বৃহৎ সূরা নাযিল করেছেন।

নিফাকের প্রকারভেদ :

কুরআন-সুন্নাহ ও পারিপার্শ্বিক সার্বিক
দিক বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে,
নিফাক মূলত দুই প্রকার।

এক. মৌলিক নিফাক।

দুই. আকস্মিক সংঘটিত নিফাক।

মৌলিক নিফাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে নিফাকের পূর্বে সত্যিকার ঈমান ছিল না। এমন অনেক মানুষ আছে যারা দুনিয়ার ফায়দা লাভ ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে তার জীবনপথে অন্তর থেকে ইসলামকে গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহর উপর ঈমানও আনয়ন করেনি। কিন্তু দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে সে তার মুরতাদ হওয়াকে গোপন রাখে। আর মুসলিম সমাজেই মুসলমান বেশে বসবাস করে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় না যে, আমি মুরতাদ। বরং যখন কোন সুযোগ পায়, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিবেচনার করে এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। এ ধরনের মুনাফিক আমাদের সমাজে অনেক রয়েছে। তারা ইদুরের মত মুসলমানদের সমাজে আত্মগোপন করে আছে। যখনই সুযোগ পায় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। আর সব সময় তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং এ লোকটি একজন খাঁটি মুনাফিক, যদিও সে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে বা মুসলিম সমাজে বসবাস করে।

একজন মুসলিম যখন কোন মুসলিম সমাজে বসবাস করে তারপর যখন সে মুরতাদ হয়ে যায়, তাকে অবশ্যই দুর্নামের ভাগি হতে হবে এবং সামাজিক মর্যাদা হারাতে হবে। এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়। আমাদের সমাজে এ ধরনের মুনাফিক অসংখ্য, যারা বাস্তবে ইসলামের অনুশাসনে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে না। কিন্তু তারা সমাজে নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করে এবং মুসলিম হওয়ার সুবিধাও ভোগ করে, অপর দিকে বিজাতিদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের থেকেও সুবিধা নেয়। তারা ইসলামের শত্রুদের দালালি করে। মুসলিম সমাজে বসবাস করে মুসলিমদের কীভাবে ক্ষতি করা যায়— এ চিন্তায় তারা বিভোর থাকে।

আবার কিছু লোক এমন আছে যারা মুসলিম ও ঈমানের দাবিদার। কিন্তু ঈমানের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলে তারা মানসিকভাবে চরম অস্বস্থিতে ভোগে। খোঁজে পায় না ঈমানের পরম তৃপ্তি। কর্মগত মুনাফিকি মাঝে মাঝে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে

যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার ঈমান তাকে জাগিয়ে তোলে। সে অনুতপ্ত হয়। তাওবা করে। আকস্মিক নিফাক বান্দাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে না, বরং তার বিধান অন্যান্য কবীরা গোনাহকারীর মতই। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যদি তিনি চান তাকে তার গোনাহের কারণে শাস্তি দিবেন। তারপর তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তবে এ জন্য তাকে অবশ্যই বিশুদ্ধচিত্তে তাওবা করতে হবে।

আল্লাহ (সুব.) বলেন,

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَيَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। আল্লাহ তাদের সে ব্যাধি আরও বর্ধিত হতে দেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কেননা তারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। (কুরআন, ২: ১০) মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরে মহান রব আরও বলেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

আর যখন তাদের সাক্ষাৎ হয় মুমিনদের সাথে তখন তারা বলে, আরে আমরা তো ঈমান এনেছি! এরপর যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আরে ওদের সাথে তো আমরা ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। (কুরআন, ২: ১৪-১৫)

মুনাফিকদের এমন চরিত্রের কারণও আল্লাহ (সুব.) আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন—

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُنِيبُوا إِلَى اللَّهِ فَمَن لَّهِ الْعِزَّةُ فَانِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا

মুনাফিকদেরকে তুমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুসংবাদ দাও! তারা মুমিনদের পরিবর্তে কাকিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা কী চায়, পার্থিব সামান্য ইজ্জত-সম্মান? অথচ সমস্ত সম্মান আল্লাহরই (হাতে)। (কুরআন, ৪: ১৩৮-১৩৯)

আল্লাহ আকবার, কত বাস্তব চিত্র! আসলেই তো, মুনাফিকরা আর কী চায়,

পার্থিব সামান্য অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ছাড়া? অথচ এ সবকিছুই রবের কায়েনাতের কর্তৃত্বাধীন। আর এসব তো তিনি তাঁর ঈমানের দাবি সত্যায়নকারী বান্দাদের জন্যই বরাদ্দ রেখেছেন; এরাই এর বৈধ হকদার। কিন্তু মুনাফিকরা তাগূতের মদদপুষ্ট হয়ে আজকে রহমানের বান্দাদের যে পরীক্ষার সম্মুখীন করছে, এটাতো মাকড়সার দুর্বল জাল ছাড়া কিছুই নয়। অথচ তারা অত্যন্ত হযোৎফুয মুমিনদের সাময়িক বিপর্যয় দেখে। এটাতো রঙিন ফানুস, অলীক কল্পনার জাল; যা মহান রব অচিরেই ধুলিসাং করে দেবেন। তখন মুনাফিকরা কোথায় মাথা গুঁজবে? তাদের ভূয়া অভিভাবকরা সেদিন কোথায় থাকবে? ওদেরতো কোনো সত্যিকার মাওলা নেই, অথচ মুমিনদের মাওলা আরশের অধিপতি। যার ক্ষমতায় কোনো শরিক নেই। না, আমেরিকাও না। এমনকি কানা দাজ্জালও নয়। তাহলে মুমিনদের আর কিসের ভয়? বিজয়ের সম্মানতো তাদেরই। এটাই মহান রবের প্রতিশ্রুতি। যা সম্পর্কে মুনাফিকরা অজ্ঞাত।

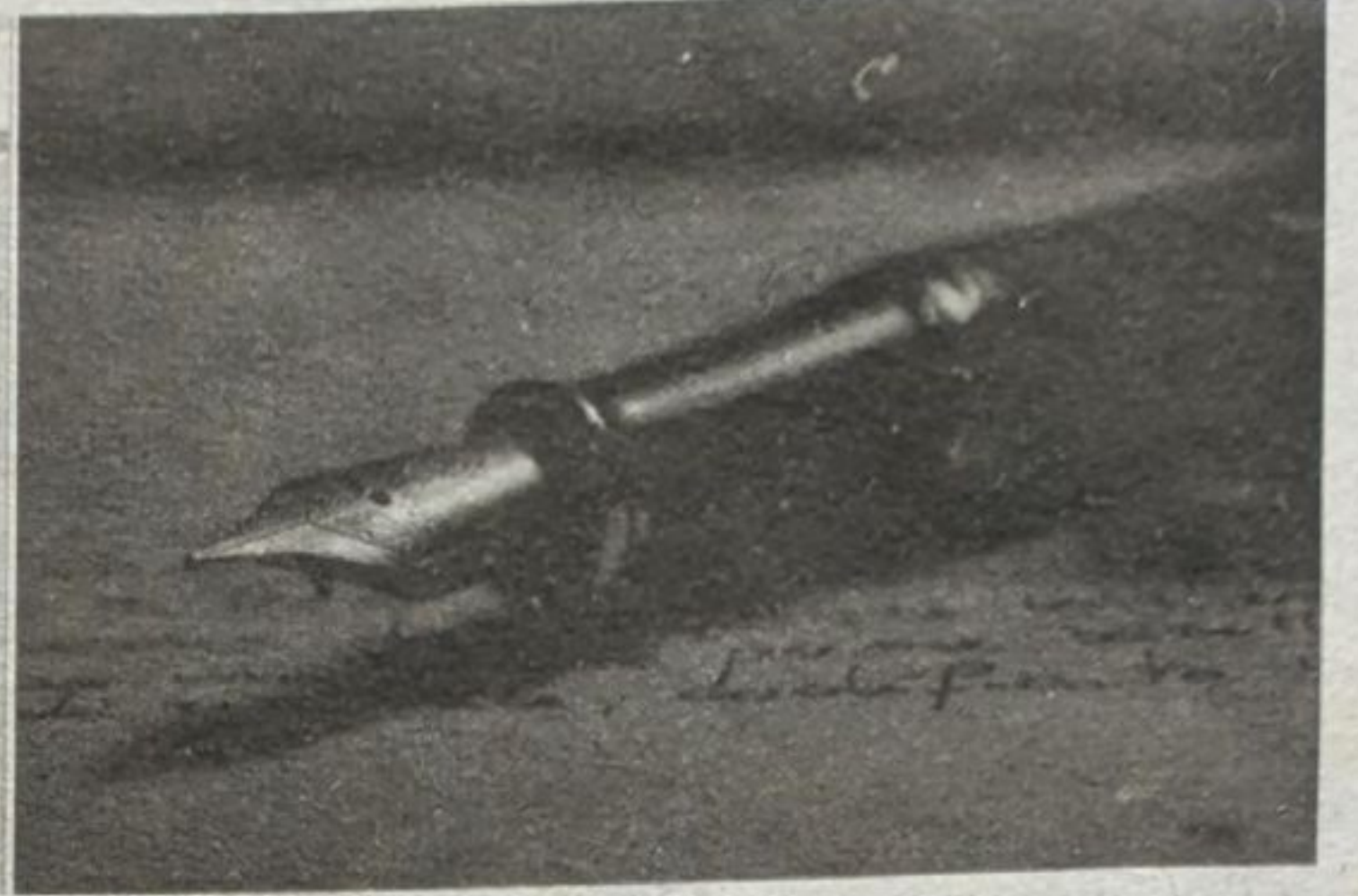
আল্লাহর শারীআহ কায়মের পথে বাধা সৃষ্টিকারী হে মুনাফিকেরা! আল্লাহর আযাবকে ভয় করো।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও বড় কঠিন। তাকিয়ে দেখো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে—রহমান তাঁর বান্দাদেরকে কীভাবে সাহায্য করছেন। আর কীভাবে পাকড়াও করছেন তাওয়াগীত ও তার সহচরদেরকে। দেখো—কীভাবে রক্তের স্রোত বয়ে চলছে উল্টো প্রবাহে। কীভাবে রচিত হচ্ছে প্রতিশোধের দুর্দান্ত ইতিহাস। পৃথিবীর সুপার পাওয়াররা কীভাবে অসহায় হয়ে পড়ছে আল্লাহর সাহায্যের সামনে। পর্যবেক্ষণ করো, ভাবো—নিশ্চয় সে আযাব তোমাকে পাকড়াও করতে ঠিক বেশি সময় নেবে না।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ خَفِيفًا

নিশ্চয় মুনাফিকদের আবাসস্থল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য সেখানে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। (কুরআন, ৪: ১৪৫)



মানবরচিত জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষণই যেন এক কালবেলা

এ মুহূর্তে বাংলাদেশে বহুল আলোচিত একটি ঘটনা হচ্ছে শিশু রাকিব হত্যা। নৃশংস বর্বর এ ঘটনা মানুষকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। অথচ মাত্র কিছুদিন পূর্বেই আমরা কেঁপে উঠেছিলাম শিশু রাজনের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়। খুব কম সময়ের মধ্যে পরপর এরকম বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড অতঃপর পত্রপত্রিকায় তার নিউজ, ইন্টারনেট, টিভিতে আলোচনা, প্রতিক্রিয়া দেখে আমাদের মনে হতে পারে হঠাৎ বুঝি এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। আসলে মোটেও তা নয়; বরং এটাই এখন এ দেশের, এই সমাজের বাস্তবচিত্র। খুব অল্প সংখ্যক ঘটনাই মিডিয়াতে আসে এবং মানুষ তা জানতে পারে। অথচ প্রতিদিনই এমন অনেক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে চলছে। রাজন হত্যার দু'দিন পরই চট্টগ্রামের চান্দগা আবাসিক এলাকায় মামার হাতে নিষ্ঠুরভাবে খুন হয় ভাগ্নে। যা মিডিয়ায় সেভাবে আসেনি। পত্রিকার বরাত অনুযায়ী এ বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয়মাসে সারা দেশে নির্মম অত্যাচারে মারা গিয়েছে ৬৯ জন। গড়ে এক মাসে প্রায় ১২ জন। এ কেবল

পত্রিকা কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্য; বাস্তবতা আরো ভয়ানক!

আর একটা বিষয় খুবই ভয়ানক তা হলো হত্যার ধরণ এবং হত্যাকারীদের প্রকৃতি। নৃশংসতা আর বর্বরতার প্রতিযোগিতায় যেন নেমেছে মানুষ! আর হত্যাকারীদের তালিকায় এখন হার হামেশাই যোগ হচ্ছে নিজস্ব আত্মীয়- বাবা, মা, মামা, চাচা এবং সাধারণ মানুষ যাদের এ ধরনের কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ডই নেই। একটি দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা যদি দিন দিন এমন অবস্থার দিকে যেতে থাকে তাহলে বলতেই হয় ধ্বংসের প্রান্ত সীমানায় পৌঁছে গেছে এ জনপদ। নিজ পিতা যখন তার তিন কন্যা সন্তানকে গলা কেটে হত্যা করে (১৬.০৫.২০১৫), জনগণের রক্ষক সেজে যখন ভক্ষক হয়ে শিশু সাইদকে হত্যা করা হয় (১৮.০৩.২০১৫), পিটিয়ে খুঁচিয়ে শিশু রাজনকে (১২.০৭.২০১৫), পায়ুপথে কমেপ্রসার লাগিয়ে যখন শিশু রাকিবকে হত্যা করা হয় (০৫.০৮.২০১৫) তখন আসলেই বলতে হয় দেউলিয়া হয়ে গেছে এ সমাজ। সুস্থ বিবেকবান প্রতিটি মানুষেরই মনে হয়- এ যেন এক কালবেলা!

কিন্তু কেন এ হত্যার মিছিল? লাশের বহর? কেন ছাত্রদলের গুলাগুলিতে বাবার কোলে বসে থাকা দু বছরের নওশীনের জীবন-প্রদীপ নিভে যায়? কেন ছাত্রলীগের সোনার ছেলেদের গুলাগুলিতে মায়ের গর্ভে গুলিবিদ্ধ হয় শিশু? কেন এসব অমানবিকতা, পাশবিকতা? কারণ কি শুধু এটা, যে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি, হয়ে গেছি চিন্তাশূন্য কিংবা আমাদের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে? আসলে এগুলো মূল কারণ নয় বরং এগুলোও ফলাফল। মূলত এর পেছনে রয়েছে

একটি ঘুণে ধরা সভ্যতা, একটি অনাদর্শিক সমাজব্যবস্থা, ভোগবাদী চরম স্বার্থবাদী আর সস্তা ও নষ্ট আবেগের সংস্কৃতি, সর্বোপরি একটি মানবরচিত মতবাদপুষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা। যার অবধারিত ফলাফল আর ফলাফলের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই হত্যা ধ্বংসের নারকীয় মিছিল! পথ কী? পাথেয় কোথায়? কেবল এবং কেবলমাত্র একটি আদর্শিক সমাজব্যবস্থা-ই পারে মানুষকে মুক্তি দিতে। আর আদর্শিক সমাজের পূর্বশর্ত একটি আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর সেই একমাত্র আদর্শটি হলো ইসলাম আর রাষ্ট্রটি হলো খিলাফাহ। প্রয়োজন এমন একজন খলীফা, যিনি আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং হক ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলবেন। মানুষ সঠিক চিন্তা, আবেগ, মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে জীবন ধারণ করে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ পায় সঠিক নিরাপত্তা। ইসলামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করল সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল। (কুরআন, ৫: ৩২)

শিশু হত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। এমনকি শিশুটি যদি মুশরিক পরিবারেরও হয়। এক যুদ্ধে মুশরিকদের একটি শিশু নিহত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা শুনে খুব মর্মান্বিত হন। তিনি বলেন- “এ শিশুরা তোমাদের চেয়েও উত্তম। সাবধান!

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ফযিলত :

চন্দ্রবর্ষের ১২তম মাস যিলহজ। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ মাসের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত। রমায়ানের শেষ দশ রাত যেমন অতীব গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, তেমনি যিলহজের প্রথম দশ দিনও খুবই ফযিলতপূর্ণ। অথচ অনেকেই যিলহজের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত নয়। ফলে তারা ঐ দিনগুলো হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দেয় এবং বঞ্চিত হয় রবের অনুগ্রহ থেকে। যারা এ মাসে হজ করতে পারে না তাদের জন্যও এ দিনগুলোতে সাধ্যমতো ইবাদাত করে



যিলহজ মাসের করণীয়

শাইখ আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ সালিহ

অশেষ নেকি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

শপথ ফজরের এবং শপথ দশ রাতের। (কুরআন, ৮৯: ১-২)

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে দশ রাত দ্বারা যিলহজের প্রথম দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ

يُحَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, (যিলহজের প্রথম) দশকের দিনগুলোর আমলের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও (কি উত্তম) নয়? নবী (সা.) বললেন, জিহাদও নয়। তবে সে লোকের কথা স্মরণ, যে নিজের জান-মাল বাজি রেখে জিহাদে বের হয়ে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে না আসে (অর্থাৎ শহীদ হয়ে যায়)।^১

করণীয় :

নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা :

যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে ১০ দিন পর্যন্ত নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা উচিত। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْحِيَ فَلَا يَمَسَّ

مِنْ شَعْرِهِ وَنَشْرِهِ شَيْئًا

উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যখন (যিলহজ মাসের) প্রথম দশ দিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)।^২

অত্র হাদীসের নিষেধাজ্ঞাটি কেবল কুরবানিদাতা ব্যক্তির সাথে খাঁস। যে ব্যক্তি কুরবানি দিতে অক্ষম তার জন্য এগুলো কাটা বৈধ।

বেশি বেশি নেক আমল করা :

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন যাবতীয় পাপ থেকে দূরে থাকা এবং নেক আমল করে অতিবাহিত করা আমাদের কর্তব্য। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. নফল সালাত আদায় করা :

নফল সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ দিনগুলোতে নফল সালাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা উচিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় আমলের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا

অক্টোবর '১৫ | ০৯

তুমি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সিজদা করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।^৭

২. নফল সিয়াম পালন করা :

রমায়ান মাস ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে যেমন শাওয়াল, মুহাররম, আরাফা, শাবান, আইয়ামে বীযসহ সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালনে অভ্যস্ত হওয়া ভাইদের জন্য একান্ত জরুরি এবং বিরাট সওয়াবের কাজ। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন আমলের কথা বলে দিন। নবী (সা.) বললেন, তুমি অবশ্যই নফল সিয়াম পালন করবে, কেননা এর সমতুল্য অন্য (নফল) কিছু নেই।^৮

বছরের যে কোন সময়ই নফল সিয়াম পালন করা যায়। তবে যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফযিলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় এ দিনগুলোতে নফল সিয়াম পালন করা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। বিশেষ করে আরাফার দিনের সিয়াম। এ সম্পর্কে নবী (সা.) বলেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أُحْسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

আমি আল্লাহর উপর আরাফার দিনের রোযা রাখার ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।^৯

৩. বেশি বেশি তাওবা করা :

প্রত্যেক মানুষ কোন না কোনভাবে পাপ করে থাকে। এজন্য সকলের উচিত হলো এসকল পাপ থেকে আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ তাআলা সবসময় বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, তারপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। (সূরা নিসা-১১০)

তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবাকে অধিক হারে কবুল করে থাকেন। যেহেতু যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন অত্যধিক ফযিলতপূর্ণ, সেহেতু এই দিনগুলোতে আমাদের সকলেরই তাওবা করা উচিত। এর মধ্যে আরাফার দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এ দিনে আল্লাহ তাআলা অনেক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مَنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَذْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ

(সা.) বলেছেন, আরাফার দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং তিনি বান্দাদের নিকটবর্তী হন। তারপর ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, (আরাফার মাঠের) এসকল মানুষ কী চায়? অর্থাৎ যা চায় তা-ই প্রদান করা হবে।^{১০}

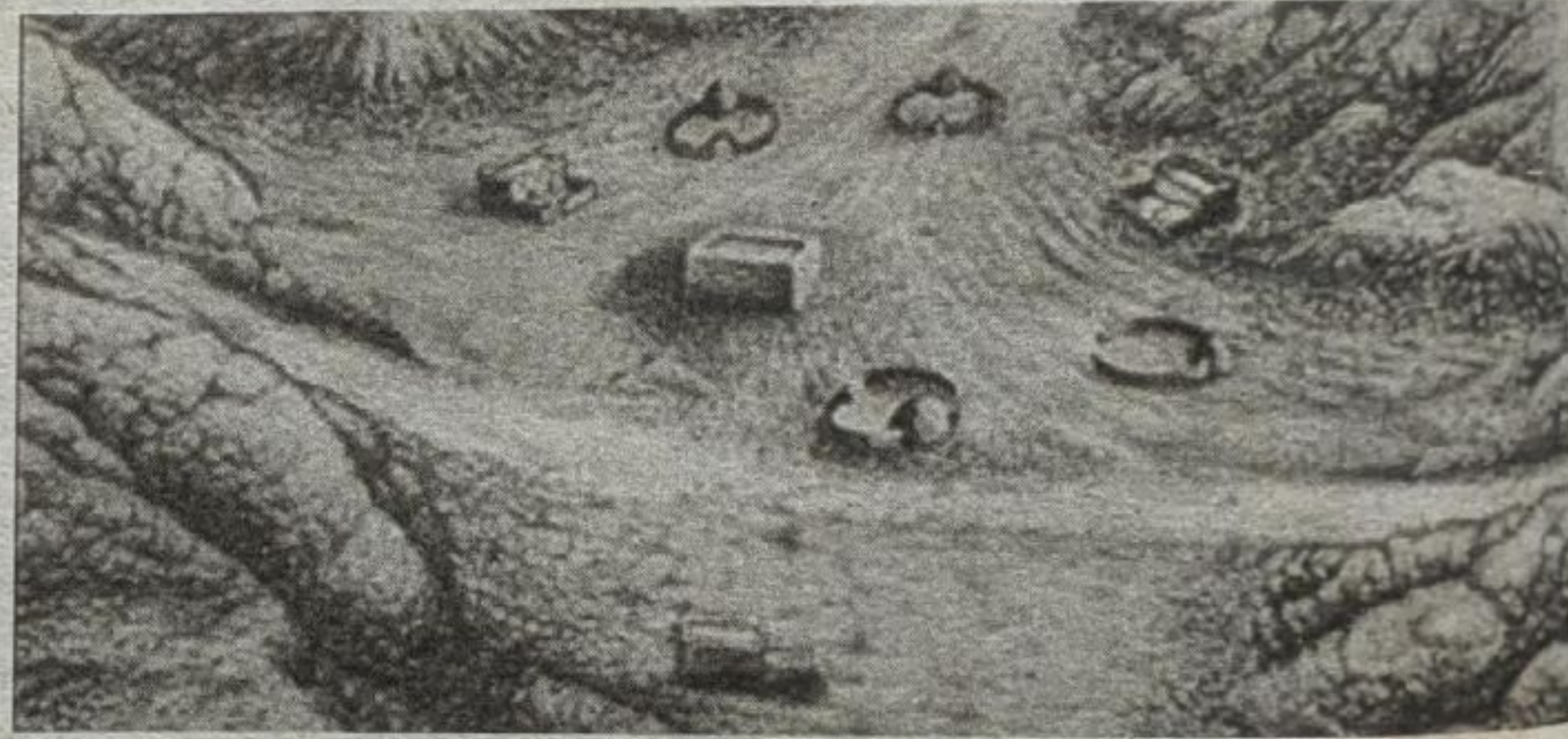
৪. বেশি বেশি নফল ইবাদাত করা :

নফল ইবাদাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ মাধ্যম। বান্দা যতবেশি নফল ইবাদাত করবে ততবেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنْ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি, কেবল এর দ্বারা কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। বরং বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে।^{১১}

ফযিলতের দিনগুলোতে নফল ইবাদাতের মর্যাদা আরো বেশি। এজন্য যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে আমরা নফল সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দুআ, দান-সাদকা, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি যাবতীয় নেক আমলের মাধ্যমে



আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করতে পারি।

যিলহজ্জের দশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ আমলের মধ্যে আরও রয়েছে ঈদের সালাত আদায় করা এবং কুরবানি করা।

৫. বেশি বেশি যিকির করা :

যিলহজ্জের ১ম দিন থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যিকির করার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾

আর বিশেষভাবে আল্লাহকে স্মরণ করো নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। (সূরা বাকারা-২০৩)

তিনি আরও বলেন,

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

আর তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করো। (সূরা হাজ্জ- ২৮)

উক্ত দুটি আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আইয়ামে মালুমাত হচ্ছে, যিলহজের দশ দিন। আর আইয়ামে মাদুদাত হচ্ছে, আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন অর্থাৎ ১১-১৩ যিলহজ।^{১৭}

৬. বেশি বেশি তাকবির পাঠ করা :

ইবনে উমর (রা.) ও আবু হুরাইরা (রা.) যিলহজের প্রথম দশকের দিকে বাজার অভিমুখে বের হতেন এবং তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। আর জনগণও তাদের তাকবিরের সাথে সাথে তাকবির দিতেন।^{১৮}

আইয়ামে তাশরীকের ফযিলত :

কুরবানির পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়ামুত তাশরিক বলা হয়। তাশরিক শব্দের অর্থ হচ্ছে, শুকানো। মানুষ এ দিনগুলোতে গোশত শূকাত দিবে থাকে বলে এ দিনগুলোর নাম আইয়ামুত তাশরিক বা গোশত শুকানোর দিন নামে নামকরণ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيْدًا أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আরাফার দিন, কুরবানির দিন ও তাশরিকের দিনসমূহ আমাদের ঈদের দিন এবং খাওয়া ও পানাহারের দিন।^{১৯}

তাশরিকের দিনগুলোতে বেশি বেশি তাকবির পাঠ করা :

বিশেষ করে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবির পাঠ করা জরুরি। এ তাকবির শুরু হয় আরাফার দিবসের সকাল থেকে এবং এটা শেষ হয় তাশরিকের দিনগুলোর শেষোক্ত দিনের আসরের নামায পর্যন্ত।^{২০}

অর্থাৎ ৯ই যিলহজ আরাফার দিন ফজর থেকে শুরু করে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত তাকবির বলতে হবে।

তাকবিরের বাক্য :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

হজ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের পূর্ববর্তী যুগেও হজের প্রচলন ছিল। কিন্তু

তারা হজের মূল নিয়মগুলোকে বিকৃত করে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদ্ধতিতে হজ পালন করে আসছিল।

অতঃপর ইসলাম আগমনের মাধ্যমে হজের প্রকৃতরূপ আবার ফিরে আসে। এর মাধ্যমে পুরো

বিশ্বে মুসলিম ভ্রাতৃদের এক অন্যান্য নজির প্রদর্শিত হয়। বিশ্বের আনাচে-কানাচে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলিমরা একত্রিত হয়ে বাস্তব সমস্যাগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে

দীনের মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়া হজের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর আরাফাতের পবিত্র ময়দান

হচ্ছে তার সভাস্থল, যাতে কোন মুশরিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।^{২১}

৭. কুরবানি করা :

কুরবান শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে উৎসর্গ করা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে নৈকট্য লাভ করা। কুরবানির মাধ্যমে একদিকে বান্দা আল্লাহর দেয়া পশুটিকে তাঁরই জন্য উৎসর্গ করে; অপরদিকে এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ

ইবাদাত। প্রাচীনকাল থেকেই কুরবানির নিয়ম চলে আসছে। আমরা জিলহজ মাসের ১০-১৩ তারিখ পর্যন্ত যে কুরবানি করে থাকি তা ইবরাহীম (আ.) থেকে প্রচলন হয়ে আসছে।

হাদীসে এসেছে,

بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মদিনায় অবস্থানকালীন দশ বছর কুরবানি করেন।^{২২}

আরেক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ ، وَلَمْ يُضَحَّ ، فَلَا يَفْرِيَنَّ مُضِلًّا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরবানির সামর্থ রাখে অথচ কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।^{২৩}

৮. হজ আদায় করা :

الحَجُّ (আল-হাজ্জ) শব্দের অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা পোষণ করা। ইসলামি পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা সহ হজের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পন্ন করাকে হজ বলা হয়।

হজ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের পূর্ববর্তী যুগেও হজের প্রচলন ছিল। কিন্তু তারা হজের মূল নিয়মগুলোকে বিকৃত করে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদ্ধতিতে হজ পালন করে আসছিল। অতঃপর ইসলাম আগমনের মাধ্যমে হজের প্রকৃতরূপ আবার ফিরে আসে। এর মাধ্যমে পুরো বিশ্বে মুসলিম ভ্রাতৃদের এক অন্যান্য নজির প্রদর্শিত হয়। বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলিমরা একত্রিত হয়ে বাস্তব সমস্যাগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে দীনের মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়া হজের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর আরাফাতের পবিত্র ময়দান হচ্ছে তার সভাস্থল, যাতে কোন মুশরিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

গণতন্ত্র, না ইসলাম? একটা বেছে নাও

উমার ইবনু আদ্রির রাহমান



পনেরতম শতাব্দী। ইউরোপে সবেমাত্র জ্ঞান-সাধনার উন্মেষ ঘটে। শাসনযন্ত্রটি ছিলো তখন পাদ্রীদের হাতে। ধর্মের অসত্য দোহাই দিয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর তারা চালাতো যাতন-যন্ত্র। নিপীড়নের হাতিয়ারটির নাম ছিল ধর্ম। দীর্ঘ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত ধর্মের নামে পাদ্রীদের আবিষ্কৃত মনগড়া বিধানের যাতাকলে নির্মমভাবে পিষ্ট হয়েছে খৃস্টান জাতি। অতঃপর জ্ঞান-সাধনার ফলে জ্ঞানী গবেষকদের নিকট ধর্মের এ অযথা দোহাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এখান থেকেই শুরু হয় জনগণ ও গীর্জা পাদ্রীদের মাঝে চরম সংঘাত। মনগড়া ধর্ম, নাকি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বিজ্ঞান? শুরু হয় দুই অসত্যের বাঁচা-মরার লড়াই। অবশেষে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে একটি আপোষরফা হয় উভয়ের মাঝে। যার সারকথা হলো, ধর্ম ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। যেখানে ধর্মের কোন পছন্দ অপছন্দ থাকবে না। গীর্জার কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। গীর্জাপতীদের কোন বাধা-বিপত্তি মানা

হবে না। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর এরই নাম গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক এ মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না বটে, তবে তাদের মতে, দুনিয়ার জীবনে উন্নতি শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা রাসুলের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কুরআন-হাদীসের কোন দিকনির্দেশনা।

এ মহাজগত এবং তার সকল কিছুর স্রষ্টা যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা তাহলে সেই মহান রবের বিধানকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করা যাবে না—এটা তো তাঁর সাথে কুফরি করা ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। আল্লাহকে যদি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মান্য করা না-ই যায় তাহলে কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনে তাঁর ইবাদাত করা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

একদিকে মহান রবের অবিনাশী বাণী উচ্চারিত হয়

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। (কুরআন- ৬: ৫৭, ১২: ৪০, ৬৭) অপরদিকে গণতন্ত্রের

ফেরিওয়ালাদের স্পর্ধামূলক কণ্ঠে বেজে উঠে— জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস!

রাসূলে আরাবি (সা.) আমাদেরকে যে সত্য শিখিয়েছেন এবং আমাদের জন্য যে দীন পূর্ণাঙ্গ করে গেছেন— সে দীন তো বলে, সার্বভৌমত্ব মহান আল্লাহর জন্যই।

নষ্টযন্ত্র গণতন্ত্রের অন্ধ পৃষ্ঠপোষকদের গণগণবিদারী শ্লোগান: সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্যই— আমাদের শান্ত-সমাহিত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। তোলপাড় তোলে জগতের পরতে পরতে। ধৈর্যে আসা বিপদকে আরো কাছে নিয়ে আসে। মুমিনদের ঈমান গর্জে উঠে। দেখে নিতে চায় এর হোতাকে।

যারা মুসলমান হিসেবে থাকতে চায়, কুরআনি বিধান পালন করতে চায় এবং নববি আদর্শ আঁকড়ে থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে পূর্ণরূপে মানতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ইসলামি জীবনধারা গ্রহণ করা ফরয বা আবশ্যকীয় বিধানরূপে সাব্যস্ত করেছেন। ইসলামকে যে ব্যক্তি তার জীবনের আদর্শ বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেয়নি, তার মুসলমানিত্বের দাবি বড়ই হাস্যকর।

কালামে ইলাহির দৃষ্ট ঘোষণা—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। (কুরআন, ৩: ১৮)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (কুরআন, ৫: ৪)

আরো ঘোষিত হয়েছে—

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন

গ্রহণ করতে চাইবে, কস্মিনকালেও তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (কুরআন, ৩: ৮৫)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা ফরয করেছেন। ইসলামকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল মতবাদ এবং অন্য সকল জীবনব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য হারাম করেছেন। অতঃপর মহান রব মুসলমানদের মধ্যকার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা করে বলেন-

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

সুতরাং তুমি তাদের মাঝে সেই বিধান অনুসারে ফায়সালা করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। (কুরআন, ৫: ৪৮)

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐশীবিধান বা ইলাহি শাসনব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন মত বা তত্ত্ব দ্বারা মুসলমানদের শাসন করা সম্পূর্ণ হারাম।

গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের শাখাগত কিছু বিষয় বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য মনে হলেও, বাস্তবে এ দুটি দীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে আকাশ-পাতাল। একটি মেনে নিলে অপরটি বাতিল হতে বাধ্য। কোন অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয়তো ইসলাম, নয়তো গণতন্ত্র।

মুসলমানদের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা হিসেবে খেলাফত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহপ্রদত্ত দীন কায়েম করার নববি তরিকা আছে, আছে আসমানি মানহাজ। ইসলাম কোন দেউলিয়া নয় যে, খেলাফত কায়েম করার জন্য কুফরি মত্ব জগতে হবে অথবা শিরকি তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে।

মানবতা যেখানে
অনন্যোপায়, ইলাহি
আওয়ায যেখানে
স্তব্ধ, ঐশীবিধান
যেখানে অবদমিত,
কুরআন যেখানে
উপেক্ষিত, যদি
আমরা সেই
গণতন্ত্রকে
শিরকি-তত্ত্ব বা
কুফরি-মত্ব বলে
আখ্যা দিই তাহলেই
মনে হয় তার
যথার্থতা আদায়
হবে। এ তো সত্যের
মাঝে মিথ্যা, আলোর
মাঝে এক ঘোর
অন্ধকার। সর্বনাশা এ
গণতন্ত্রের অনিবার্য
ফল হলো
আলো-আধারে
একীভূত হওয়া।
-শাইখ উসামা বিন
লাদিন (রহ.)

গণতন্ত্রের স্বাধীনতা

পশ্চিমারা নিজেদের জীবন থেকে ধর্মকে মুছে ফেলার কারণে সবকিছুতে তারা শুধু লাভ-লোকসানই দেখে, ধর্মের জ্ঞান তোয়াক্কা নেই, নেই সত্যের সৌন্দর্য এবং একনিষ্ঠতার বাহারি। আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মনুষ্যত্ব বর্জিত কিছু মানদণ্ড তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে। আর সেগুলো হলো-

ক. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

খ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

গ. অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা

ঘ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

এই মুখরোচক শিরোনামগুলোর আড়ালে লুকায়িত পৈশাচিকতা, বর্বরতা আর স্বেচ্ছাচারিতার সাক্ষ্য দেয় পৃথিবী। মুসলিমদেরকে হত্যা করা, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা, দেশ দখল করে

খনিজ সম্পদ দখল করা, এমনকি বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত রাসূলে আকরাম (সা.)-কে কটুক্তি করাকে তাদের স্বাধীনতা মনে করে নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে। কিন্তু হায়! আমরা তার যথাযথ পাল্টা জবাব দেয়ার সাহসও করছি না। জবাব দেয়াটা কি আমাদের স্বাধীনতা নয়? শত ধিক, এই অভিশপ্ত গণতন্ত্রের উপর- যে কুফরি সিস্টেম আমাদের মস্তিষ্কের উপর অচেতনতার জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

গণতন্ত্র : যার অনিবার্য ফল হলো শিরক ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। এটি তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। কারণ মানুষের পক্ষে সার্বজনীন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।

ইসলামের আইন-কানুন কুরআন-হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং যে আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই তা শরীয়তের নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ করে বের করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি নিজেই আইন প্রণয়ন করে, অথবা কোন সরকার এই তামাশার মহড়া দেয় তাহলে সে সরকার যেন নিজেকে রব হিসেবে দাবি করে বসলো। কারণ কুরআনুল হাকীমে মহান রবুল আলামীন ফেরাউনের ব্যাপারে বলেছেন যে, সে জমিনে নিজেকে রব বলে দাবি করেছে। অথচ সে কিন্তু নিজেকে আসমান-যমিনের স্রষ্টা বলে দাবি করত না। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না। বরং আল্লাহ তাআলাকে নিজের রব বলে স্বীকারও করত। তাহলে ফেরাউন নিজেকে রব দাবি করার অর্থ কী?

হ্যাঁ, সে নিজেকে রব দাবি করার অর্থ হলো, যেকোন হুকুম জারি করা বা আইন প্রণয়নের অধিকার দাবি করত। আর এ অর্থেই সে নিজেকে রব দাবি করেছিল। অর্থাৎ তার মনগড়া আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ

আর ফেরাউন তার জাতিকে ডেকে

জড়ো করে বলল, হে আমার জাতি! আমি কি মিসরের সার্বভৌমত্বের অধিকারী নই? (কুরআন, ৪৩: ৫১)

আজ আমাদেরকে যে বিষয়টি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার, যা থেকে আমরা অনেক দূরে— অথচ সেটাই আমাদের মূল চালিকাশক্তি। তা হলো, নববি তরিকা বা মুহাম্মাদি আদর্শ, আহমাদি গুলিস্তা যে ঋণ থেকে সিদ্ধিহত হয়, সে গুলিস্তা বা বাগানের কলিরা যেভাবে ফুটল এবং মানবতাকে যে ঘ্রাণে বিমোহিত করল, সে ঋণ হলো আল-কুরআন।

মহান আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের এসব কাহিনী আমাদের সামনে কেন পেশ করেছেন? শুধুমাত্র প্রাগৈতিহাস হিসেবে? নাকি এসব ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য? এর মূল কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে, সকল আধার ঘুচিয়ে আমাদের সামনে ভেসে উঠে যে, এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো— আমরা যেন এমন কোন বাদশা বা ব্যবস্থা না মানি, যারা সার্বভৌমত্বের দাবি করে। যেন ফেরাউনের মত কোন শাসককে মেনে নিয়ে শিরকের মধ্যে লিপ্ত না হই। কারণ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার মানেই হচ্ছে তাকে রব বলে স্বীকার করা।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,
 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য এমন আইন-কানুন প্রণয়ন করে— যার নির্দেশ আল্লাহ দেননি? (কুরআন, ৪২: ২১)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ হয়ে দাঁড়ায় সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা দাবি করে, ফেরাউন সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করার ফলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে ভূয়া রব হয়ে গেছে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ ফেরাউনের স্থানেই অধিষ্ঠিত। তো ফেরাউনকে মানলে যদি শিরক হয়— তাহলে গণতন্ত্র মানলে কেন শিরক হবে না?

১১ পৃষ্ঠার পর

সামর্থবান প্রতিটি মুসলিমের উপর হজ ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

যারা যাতায়াতের সামর্থ রাখে সেসব মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবাঘরে হজ করা ফরয। আর যে কুফরি করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষী। (কুরআন, ৩: ৯৭)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর বিধানাবলি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।।

(Footnotes)

^১ সহীহ বুখারি, হা/৯৬৯; আবু দাউদ, হা/২৪৪০; তিরমিযী, হা/৭৫৭; ইবনে মাজাহ, হা/১৭২৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৬৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা/৫০০০; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হা/২৪২৪; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানি, হা/১২১৫৮; বাযহাকি, হা/৮১৭৫; সুনানে বাযযার, হা/১৭৭৩; শারহুস সুন্নাহ, হা/১১২৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/১৯৮৮৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা/৮১২১; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১২৪৮; মিশকাত, হা/১৪৬০।

^২ সহীহ মুসলিম, হা/৫২৩২; নাসাঈ, হা/৪৩৬৪; ইবনে মাজাহ, হা/৩১৪৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৫১৭; সুনানে কুবরা লিল বাইহাকি, হা/১৯৫০০; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হা/৬২৭১; শারহুস সুন্নাহ, হা/১১২৭; জামেউস সগীর, হা/৫২১; মুসনাদে হুমাইদি, হা/৩১২; মিশকাত, হা/১৪৫৯।

^৩ সহীহ মুসলিম, হা/১১২১; ইবনে মাজাহ, হা/২০১; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৪৩১; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৮৯; মিশকাত, হা/৮৯৭।

^৪ মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৫৩৩; নাসাঈ, হা/২২২২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৩৩০; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/১৮৯৩; সহীহ তারগীব ওয়াত

তারহীব, হা/৯৮৬; জামেউস সগীর, হা/৭৪৯২।

^৫ সহীহ মুসলিম, হা/২৮০৩; তিরমিযী, হা/৭৪৯; ইবনে মাজাহ, হা/১৭৩০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৬৩২; শারহুস সুন্নাহ, হা/১৭৯০; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০১০; জামেউস সগীর, হা/৭৩০০; মিশকাত, হা/২০৪৪।

^৬ সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫৪; নাসাঈ, হা/৩০০৩; ইবনে মাজাহ, হা/৩০১৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/২৮২৭; দার কুতনী, হা/২৭৯২; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হা/২৮১২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৭০৫; সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৫৫১; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১১৫৪; মিশকাত, হা/২৫৯৪।

^৭ সহীহ বুখারী, হা/৬৫০২; মুসনাদুল বাযযার, হা/৮৭৫০; শারহুস সুন্নাহ, হা/১২৪৮; মিশকাত, হা/২২৬৬।

^৮ তা'লীকে বুখারী, ২/২৪ পৃঃ আইয়ামে তাশরীকে আমল করার ফযীলত অধ্যায়; শারহুস সুন্নাহ, ৪/৩৪৪ পৃঃ।

^৯ তা'লীকে বুখারী, কিতাবুল ইদায়নের তাশরীকের দিনগুলোতে আমল করার ফযীলত অনুচ্ছেদ।

^{১০} আবু দাউদ, হা/২৪২১; তিরমিযী, হা/৭৭৩; নাসাঈ, হা/৩০০৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪১৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/২১০০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৫৮৬; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হা/১৪২২০; বাইহাকি, হা/৮২৪৫; সুনানে দারেমী, হা/১৭৬৪; শারহুস সুন্নাহ, হা/১৭৯৬; জামেউস সগীর, হা/১৪১৫২।

^{১১} ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২৮৪।

^{১২} উমদাতুল কারী ১০/৩১০।

^{১৩} তিরমিযী, হা/১৫০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৯৫৫; মিশকাত, হা/১৪৭৫; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

^{১৪} ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৫৬; দার কুতনী, হা/৪৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৭৫৬৬; জামেউস সগীর, হা/১১৪৩৬।

আমাদের ও ওদের ঈদ

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ



ঈদ আমাদের জাতীয় উৎসব। বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

সকল জাতির নিজস্ব উৎসব আছে, আর ঈদ হলো আমাদের উৎসব। হাদীসের এই বাণী গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ। এখানে যে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলা হয়েছে তা ছাড়া মুসলিম উম্মাহর মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান মুসলিম-সমাজে একদিকে আছে আদর্শের প্রশ্নে ব্যাপক শৈথিল্য ও আপোষকামিতা, অন্যদিকে জাহেলি বিভেদ-বিভাজনের জন্য চরম হিংস্রতা ও অসহিষ্ণুতা। এ কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত। ভাষা ও অঞ্চলের বিভাজন, বর্ণ ও শ্রেণির বিভাজন, এমনকি রাজনৈতিক দল ও মতের বিভাজনও মুসলিম-সমাজে এত প্রকট যে, এসব কারণে অন্যের সম্পদ ও সম্মান লুণ্ঠন এবং রক্তপাত ও প্রাণহানী খুবই সাধারণ ব্যাপার। এই শ্রেণি-পরিচয়ই এখন ন্যায়-অন্যায় এবং শত্রুতা-মিত্রতার প্রধান মাপকাঠি। অথচ ইসলাম একে চিহ্নিত করেছে জাহেলিয়াত ও অন্ধকার বলে।

পক্ষান্তরে দীন ও ঈমান এবং বিশ্বাস ও আদর্শের ক্ষেত্রে এরাই এতই উদার (!)

যে, তা বিসর্জন দিতেও তাদের কোথাও কোনো টান পড়ে না। আর এখন তো মুসলিমসমাজে এমন একটি শ্রেণিও তৈরি হয়ে গেছে, যারা পৌত্তলিকতার অন্ধকারকেই আলো বলে গ্রহণ করতে এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়কেই প্রকৃত মিত্র বলে ভাবতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে! বলাবাহুল্য, এই ধর্মহীনতার সুযোগ অন্তত ইসলামে নেই।

সকল অন্যায় বিভাজন ও দলবাজির চেতনাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কুরআন বলে, মানুষের ভাষা ও বর্ণের যে বৈচিত্র্য এবং শ্রেণি ও পেশার যে ভিন্নতা তা আল্লাহরই সৃষ্টি। এটা আল্লাহর সৃজনক্ষমতার জীবন্ত নিদর্শন এবং তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর কৃষ্ণলা ও জীবনের চাকাকে সচল রাখার জন্যই মানুষকে বহু শ্রেণি ও পেশায় বিভক্ত করা হয়েছে। এটা কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িকতার উপাদান নয়, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি তো নয়ই।

আল্লাহর কাছে মানবের মর্যাদা তার এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়। মানবের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তার কর্মের ভিত্তিতে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাকওয়াবান। (কুরআন, ৪৯: ১৩)

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ

আল্লাহ তাআলা নির্মূল করে দিয়েছেন তোমাদের মধ্যকার মূর্থতার অভিমান ও বংশের গৌরব। (এখন মানুষ শুধু দুই ভাগে বিভক্ত :) মুত্তাকি ঈমানদার ও দুর্ভাগা বদকার। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর আদম সৃজিত মাটি থেকে। (সুনানে তিরমিযি: ৩২৭০, সিলসিলা সহীহা: ২৭০০, মিশকাত: ৪৮৯৯)

সুতরাং মানুষের মূল পরিচয় দুটি— ঈমানদার ও বে-ঈমান। মানবসম্প্রদায়ও দুই জাতিতে বিভক্ত— মুসলিম ও কাফির। কোনো মুসলিম যেমন ভাষা ও বর্ণ এবং পেশা ও রাজনীতির ভিন্নতার কারণে কোনো মুসলিমের পর হতে পারে না তেমনি কোনো কাফির কুখ্য ভাষা ও বর্ণ কিংবা অঞ্চলগত অভিন্নতার কারণে মুসলমানের স্বজাতি হতে পারে না।

মানবজাতির এটিই হচ্ছে মূল পার্থক্য, যা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। প্রকৃতির বিধান ও জীবন যাপনের নীতি দুক্ষেত্রেই তা অটল ও অলঙ্ঘনীয়। রব্বুল আলামীন বলেন— وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ - إِلَّا مَنْ رَجَعَ رَبُّكَ وَلَدَيْكَ خَلَقَهُمْ وَتَنَبَّأَهُمْ كُلَّهُمْ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমার রব ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে তারা নয়, যাদেরকে তোমার রব দয়া করেছেন। আর তিনি এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 'আমি জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।' তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই। (কুরআন, ১১: ১১৮-১১৯)

এ হচ্ছে প্রকৃতির বিধান, প্রকৃতির গুণের অমোঘ ঘোষণা। অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ فِي الظُّلُمَاتِ وَلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

দীনের বিষয়ে জবরদস্তি নেই। সুপথ ও
ভ্রান্তি সুস্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে।
সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করেছে ও
আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখেছে সে তো
ধারণ করেছে এমন এক মজবুত হাতল,
যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
আল্লাহ সব শোনে, সব জানেন।
যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের ওলী।
তিনি তাদেরকে বের করে আনেন
অন্ধকার থেকে আলোতে। আর যারা
কুফরি করে তাগূত হয় তাদের
অভিভাবক। যারা তাদেরকে নিয়ে যায়
আলো থেকে অন্ধকারে। এরাই হচ্ছে
জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা
থাকবে চিরকাল। (কুরআন, ২:
২৫৬-২৫৭)

সুতরাং ইসলাম ও কুফরের এই পার্থক্য
চিরন্তন। মানুষের সাধ্য নেই এই পার্থক্য
নির্মূল করার এবং অবকাশও নেই।
মুমিনের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। আর
মুমিনের স্বজন ও স্বজাতি আল্লাহর
রাসূল, সাহাবা-তাবেয়ী এবং সকল
যুগের, সকল ভাষার মুমিন-মুসলমান।
পক্ষান্তরে কাফিরের অভিভাবক তাগূত
ও তার সহযোগিরা। আর তার স্বজন ও
স্বজাতি সকল যুগের কাফির-মুশরিক,
মুলহিদ-মুনাফিক শ্রেণি। ইসলাম সকল
অন্যায় ভেদাভেদকে বিলুপ্ত করেছে,
কিন্তু এই আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়
স্বকীয়তা রক্ষার সর্বোচ্চ আদেশ
করেছে।

কুরআন মাজীদে অনেক আয়াতে
আল্লাহ তাআলা এই বিধান দ্ব্যর্থহীন
ভাষায় ঘোষণা করেছেন। পড়ুন-
কুরআনের সূরা নং ৩: আয়াত নং
২৮-২৯। আরো দেখুন- ৪ : ১৩৯,
১৪৪; ৫ : ৫১, ৫৭, ৮১; ৯ : ৩৩; ৫৮
: ২২ ও ৬০ : ১।

অন্তরঙ্গতার শক্তিশালী প্রকাশ সাদৃশ্যে।
এ কারণে অমুসলিমের সাদৃশ্য গ্রহণ
মুসলমানের জন্য পরিষ্কার ভাষায় নিষিদ্ধ
করা হয়েছে। এত অধিক হাদীসে তা
নিষেধ করা হয়েছে যে, ঐ সকল হাদীস
ও সুন্নাহ সংকলন করা হলে একটি
আলাদা পুস্তিকা হবে।

মদীনায় মুসলিমদের প্রতিবেশী সম্প্রদায়
ছিল ইহুদিরা। তাদেরকে বলা হয়েছে,
আহলে কিতাব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)
সর্বপ্রকার উদারতা ও কল্যাণকামিতা
সত্ত্বেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে
স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন এবং অত্যন্ত
গুরুত্বের সাথে মুসলমানদেরকেও তা
রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন।
ইবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে
লেবাস-পোশাক, বেশ-ভূষা,
পর্ব-উৎসব, আইন-বিচার, দাম্পত্য ও
সামাজিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে
স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিশেষ বিধান দান
করেছেন এবং তা প্রয়োগ করেছেন।
হাদীসে এ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর
নিষেধাজ্ঞা এসেছে,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য
গ্রহণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু
দাউদ: ৪০৩৩, কানযুল উম্মাল:
২৪৬৮০, বাযযার: ২৯৬৬, জামিউস
সগীর: ৮৫৯৩, বুলগুল মারাম: ১৪৭১)
তো ইসলামে ‘আপন’-‘পরে’র যে
পরিষ্কার ধারণা এবং স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা
রক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সেটিই হচ্ছে
এ নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত হাদীসের
ভাব ও ব্যঞ্জনা। এ হাদীস যেমন নির্দেশ
দেয় ইসলামের ঈদকে গভীর শ্রদ্ধা ও
ভালবাসার সাথে গ্রহণ করার- তেমনি
আহ্বান জানায় অমুসলিমদের
পর্ব-উৎসবকে সর্বোত্তমভাবে বর্জন
করার।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জাহেলি
যুগের পর্ব-উৎসবকে এমনভাবে বর্জন
করেছিলেন যে, আজ মদীনা মুনাওয়ারায়
সেসবের কোনো নাম-নিশানাও নেই।
হাদীসে এসেছে,

عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه و
سلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيها
فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيها فإن
الله قد أبدلكم يومين خيرا منها يوم الفطر ويوم
النحر

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)
যখন মদীনায় এলেন তখন মদীনাবাসীর
নিজস্ব দুটি উৎসবের দিবস ছিল। নবী
(সা.) বললেন, আল্লাহ তাআলা
তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে
উত্তম দুটি দিন দান করেছেন : ঈদুল

ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন।
(মুসনাদে আহমাদ: ১২৮৫০)
ইসলাম যেমন বিধর্মীদের প্রতি ক্ষমা ও
সহিষ্ণুতা এবং উদারতা ও
কল্যাণকামিতার সর্বোচ্চ উদাহরণ
তেমনি স্বকীয়তা ও মূল্যবোধ এবং ন্যায়
ও আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষহীনতারও
ইস্পাতকঠিন দৃষ্টান্ত। তাই চারপাশে
উচ্চারিত উদারতার ফাঁকা বুলিতে
একজন মুসলিম কখনো প্রতারিত হতে
পারে না। প্রকৃতপক্ষে এসব আহ্বান
উদারতার নয় আদর্শত্যাগের আহ্বান।
একথাও একজন মুসলিমের স্মরণ রাখা
দরকার যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণা
ও ক্রোধের বিষয় হচ্ছে মুসলিমসমাজে
জাহেলিয়াতের প্রচার। আল্লাহর রাসূল
(সা.) ইরশাদ করেন-

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْجِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتِغٍ
فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطْلَبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ
حَقٍّ لِيُرِيَقَ دَمَهُ

তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক
ঘৃণিত : কাবার সীমানায় পাপাচার
সংঘটনকারী, ইসলামে জাহেলি প্রথার
প্রসারকারী ও অন্যায় রক্তপাতকারী।
(বুখারি: ৬৮৮২)

তো আল্লাহ যাকে ঈমানের দৌলত দান
করেছেন এবং মুসলিমসমাজের একজন
গর্বিত সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য দান
করেছেন তার পক্ষে তো কোনোভাবেই
সম্ভব নয় আদর্শের বিষয়ে হীনমন্যতার
শিকার হওয়া এবং পৌত্তলিক সমাজ ও
সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা পোষণ
করা।

বর্তমান যুগের ‘ফিকরি ইরতিদাদ’ তথা
চিন্তাগত ধর্মত্যাগের যে প্রবণতা
ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে তা
থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়
মজবুত ঈমান ও সহীহ ইলম। সাধারণ
মুসলমানদের মাঝেও দীনি ইলমের
প্রচার ও ঈমানি দাওয়াত ও তারবিয়াত
ছাড়া এই সর্বগ্রাসী ফিতনা মুকাবিলা
করার আর কোনো উপায় নেই। আসুন
এই ঈদের ইজতিমায় আমরা একমাত্র
ইসলামকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার
এবং ইলম ও দাওয়াতের পথে নিজেকে
উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করি। রব্বুল
আলামীন আমাদেরকে তাওফিক দান
করুন। আমীন।।

আমার সন্তাসী হয়ে উঠার গল্প

তারেক মেহান্না



ঠিক চার বছর আগের এই দিনে আমি স্থানীয় হাসপাতালে আমার শিফটিং ডিউটি শেষ করে গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখন দুই ফেডারেল এজেন্ট (FBI) আমার পথরোধ করে। তাঁরা আমাকে দুটি প্রস্তাবের 'মাঝে' একটি বেছে নিতে বলে। একটি সহজ, অপরটি কঠিন। তাদের ভাষায় "সহজ" প্রস্তাবটি ছিল সরকারের চর অর্থাৎ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার। সেটি করলে আমাকে কখনও আদালত বা কারাগারের ত্রিসীমানায়ও যেতে হবে না। আর কঠিন প্রস্তাবটির বাস্তব রূপ আজ আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমি কঠিন প্রস্তাবটিই বেছে নিয়েছি আর তাই গত চার বছরের অধিকাংশ সময় ধরে আমি আলমারির খোপের মত ছোট্ট একটা কক্ষে দিনের ২৩ ঘন্টাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দি হয়ে কাটিয়েছি। আমাকে এতদিন আটকে রাখতে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এফবিআই ও তাদের আইনজীবীরা কঠিন পরিশ্রম করেছে। সরকার সাধারণ মানুষের পকেটের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। শেষমেশ আজ আমাকে আপনাদের সামনে হাজির করা হয়েছে যেন আমাকে আরো দীর্ঘদিন কারাভোগের সাজা দেওয়া যায়।

রায় ঘোষণার এই দিনটিকে সামনে রেখে অনেকেই আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। আপনাদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী বললে আমার উপকার হবে, আমার কী কথা বলা

উচিত ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন আমার ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত যাতে করে লঘু শাস্তি হয়। অনেকে বলেছেন ক্ষমা চাই বা না চাই, আমার কপালে কঠিন শাস্তিই জুটবে। কিন্তু সেসব পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি আজকে শুধু নিজেকে নিয়ে কয়েক মিনিট বলতে চাই।

যখন আমি আমেরিকান সরকারের বেতনপুষ্ট গুপ্তচর হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, তখন সরকার আমাকে আটক করল মুজাহিদ্দীনদের সাহায্য করার 'অপরাধে!' অথচ এই মুজাহিদ্দীনরা মুসলিম বিশ্বের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। মিডিয়ার ভাষায় এরা হচ্ছে 'সন্তাসী' বা 'টেরোরিস্ট!'

আমি কোনো মুসলিম দেশে জন্মগ্রহণ করিনি। এই আমেরিকাতেই আমার জন্ম আর বেড়ে উঠা। আর এ কারণেই অনেক মানুষ আমার উপর রীতিমত ক্ষেপে আছে! তাদের কথা হলো, কীভাবে এই লোকটা একজন আমেরিকান হয়েও সন্তাসীদের পক্ষে অবস্থান নিতে পারলো! কীভাবে ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলো! মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস তার পারিপার্শ্বিকতার আদলে গড়ে উঠে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আর তাই আমি বলছি, আমার আমেরিকা বিরোধীতার পেছনে স্বয়ং আমেরিকাই দায়ী।

ছয় বছর বয়স থেকে আমি কমিক

যখন

আমি আমেরিকান সরকারের বেতনপুষ্ট গুপ্তচর হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, তখন সরকার আমাকে আটক করল মুজাহিদ্দীনদের সাহায্য করার 'অপরাধে!' অথচ এই মুজাহিদ্দীনরা মুসলিম বিশ্বের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। মিডিয়ার ভাষায় এরা হচ্ছে 'সন্তাসী' বা 'টেরোরিস্ট!'

বইয়ের একটা বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলতে শুরু করি। ব্যাটম্যানের চরিত্রটি আমার মনে একটা ধারণা খুব স্পষ্টভাবে গেঁথে দেয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতার সাথে আর তা হলো— গল্পের চরিত্রগুলোর মতো এই দুনিয়াতেও অত্যাচারী যালিম আছে। আছে নির্যাতিত-মাযলুম। আর তাদের মাঝে আছে এমন কিছু মানুষ যারা নিপীড়িত শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বাস্তবতা আমাকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে, আমার পুরো শৈশব জুড়ে আমি যেসব বইয়েই এ ধরনের বাস্তবতা খুঁজে পেতাম সেগুলো সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম। আংকেল টম্‌স কেবিন ও ম্যালকম এক্স এর আত্মজীবনী প্রভৃতি বইগুলো আমার মাঝে সেই ধারণাটিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। এমনকি ‘দ্য ক্যাচার ইন দ্য রি’ (The Catcher in the Rye) বইটিতেও আমি এই ধরনের চেতনার ছাপ খুঁজে পাই।

হাইস্কুলে উঠার পরে আমি সত্যিকার ইতিহাস ক্লাস করা শুরু করি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেই ব্যাটম্যানের কমিকের মতোই তো লাগছে সবকিছু! আমি আবিষ্কার করলাম শোষক-শোষিতের এই ঘটনাবলি উপন্যাসের সীমানা পেরিয়ে আসলে আরো অনেকবেশি বাস্তব। আমি নেটিভ আমেরিকানদের (আমেরিকার আদি অধিবাসী) ইতিহাস পড়লাম এবং জানতে পারলাম বহিরাগত ইউরোপিয়ানদের হাতে তাদের কী করুণ দশা হয়েছিল। আবার এই ইউরোপ থেকে আগত লোকদের বংশধরেরা কিভাবে রাজা জর্জ (৩য়) এর হাতে শোষিত হয়েছিল। আমি পল রিভিয়ার, টম পেইনদের সম্পর্কে জানলাম। জানলাম কীভাবে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল। আজকে সেটাকেই আমরা আমেরিকান রেভ্যুলেশন ওয়ার হিসেবে উদযাপন করি।

ছোটবেলায় শিক্ষাসফরে আমরা এই বিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো দেখতে বের হতাম। এই আদালতের অদূরেই তেমন কিছু যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে। আমি

হারিয়েট টাবম্যান, ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউনদের সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। তারা ছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রপথিক। আমি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম ইমা গোল্ডম্যান, ইউজিন ডেব্‌স এবং লেবার ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা। জানতে পারলাম সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব লোকদের দুঃখের ইতিহাস। আমি আরও জানলাম অ্যানা ফ্রাংকের কাহিনী, নাতসিদের বর্বরতার কথা, কীভাবে তারা সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা করেছে এবং বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ করেছে। জানলাম রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকারের জন্য

আমি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম ইমা গোল্ডম্যান, ইউজিন ডেব্‌স এবং লেবার ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা। জানতে পারলাম সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব লোকদের দুঃখের ইতিহাস। আমি আরও জানলাম অ্যানা ফ্রাংকের কাহিনী, নাতসিদের বর্বরতার কথা, কীভাবে তারা সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা করেছে এবং বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ করেছে। জানলাম রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের গল্প।

সংগ্রামের গল্প। হো চি মিন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে জানলাম কীভাবে ভিয়েতনামবাসীকে নিজেদের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যুগ যুগ ধরে একেরপর এক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আরো জেনেছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলা আর তৎকালীন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সম্পর্কে।

এ সব ইতিহাসই যেন আমার ছয় বছর বয়সে শেখা কমিক বইয়ের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। যালিম এবং মাযলুমের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যখনই এসব গল্প পড়তাম, সবসময়ই আমি নিজেকে শোষিত মানুষের পক্ষে অনুভব করতাম। মনের অজান্তে আমি শোষিতদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সম্মান ও সমর্থন করতে শুরু করেছি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আমি আমার ক্লাস নোটগুলোকে কখনই অযত্নে ফেলে দিতাম না। আমার

বেডরুমের আলমারিতে সেই ক্লাসনোটগুলো এখনও দিব্যি সাজানো আছে।

কিন্তু ইতিহাসের মহানায়কদের একজন যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ম্যালকম এক্স। তার অনেক কিছুই আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি তার পরিবর্তন দেখে। ম্যালকম এক্সকে নিয়ে নির্মিত স্পাইক লি এর “এক্স” চলচ্চিত্রটা আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না। এটি প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার একটি চলচ্চিত্র, যেখানে দেখা যায় শুরুর দিকটাতে যে ম্যালকম এক্স ছিলেন একজন অশিক্ষিত অপরাধী, শেষের দিকটাতে সেই ম্যালকমই পরিণত হন

একজন স্বামী, একজন পিতা, গণমানুষের রক্ষাকর্তা, একজন বাগ্মী নেতা এবং হজ পালনকারী একজন নিয়মানুবর্তী মুসলিম ব্যক্তিতে। সবশেষে তিনি শহীদ হন।

ম্যালকমের জীবন আমাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে।

আর তা হল ইসলামটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো বিষয় নয়। জন্মসূত্রে শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মালেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। এটা কোনো সংস্কৃতি বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নয়। বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা, এটি একটি জীবনবোধ। আর এটা গ্রহণ করার জন্যে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে বা কী পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। এ বিষয়টা আমাকে ইসলাম নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি তখন কেবল কিশোর। কিন্তু ইসলাম

আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলো, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাবার ব্যর্থতা অনেক ধনী আর বিখ্যাত মানুষদের বিষাদ আর আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে, কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? এই মহাবিশ্বে আমরা কেন, কিসের আশায় বেঁচে আছি? ইসলাম আমাকে কেবল জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়ে ক্ষান্ত হলে না, বরং দুনিয়ার বুকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে তাও শিখিয়ে দিলো।

ইসলামে খৃস্টধর্মের মত যাজকতন্ত্রের জটিলতা নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ কিছু পুরোহিতের দারস্থ হতে

ভালবাসাকে ধ্বংস করতে তৎপর। আমি দেখেছি, আফগানিস্তানের মুসলিমদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করেছে। আমি দেখেছি, বসনিয়ার মুসলিমদের উপর সার্বিয়ানদের অত্যাচার। দেখেছি, চেকনিয়ার মুসলিমদের উপর রাশিয়ার অত্যাচার। আমি দেখলাম, লেবাননের মুসলিমদের সাথে ইসরাইল কী অন্যায় করেছে এবং যা সে আজও চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে, আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতায়।

আমার এও অজানা ছিল না যে, আমেরিকা নিজেই মুসলিমদের সাথে কী ভয়ানক অন্যায় করে আসছে। আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম,

আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাক জুড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

সেই বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মরণব্যাদি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল বহুগুণে। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ঔষধপত্র প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু।

হয়। তাই আমি নিজেই কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষাগুলো ঘাটতে আরম্ভ করলাম। এই দুনিয়া, এই দুনিয়ায় আমার জীবনে, আমার চারপাশের মানুষের জীবনে আর সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের কী দেওয়ার আছে, তা জানার আগ্রহ থেকে আমি শুরু করলাম জ্ঞানার্জনের যাত্রা। আমি যতই ইসলাম সম্পর্কে জানতে লাগলাম ততই ইসলামকে বহুমূল্যবান সোনার টুকরোর মতো মূল্যবান মনে করতে লাগলাম। এগুলো উঠতি বয়সের কথা, কিন্তু আজকেও আমি শত চাপ আর ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, আমি একজন গর্বিত মুসলিম।

আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু একসময় নিবদ্ধ হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের জীবনে। আমি যদিকেই তাকাতাম, সেদিকেই দেখতাম বড় বড় পরাশক্তিগুলো আমার

জানলাম কীভাবে ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাক জুড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেই বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মরণব্যাদি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল বহুগুণে। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ঔষধপত্র প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু। আমার মনে আছে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম, “60 Minutes” প্রোগ্রামে, সেখানে সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেছিলেন, “এটাই তাদের যথার্থ পাওনা!” আমি দেখলাম কীভাবে কিছু মানুষ এই নির্মম শিশু হত্যার ঘটনায় শান্ত থাকতে না পেরে এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে ১১ সেপ্টেম্বরে টুইনটাওয়ার উড়িয়ে এর প্রতিশোধ নেয়।

এর পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে বসল। আবিষ্কার করলাম “Shock & Awe” (এক ধরনের আক্রমণাত্মক মিলিটারি Tactic) এর পরিণতি। ইরাকের যন্ত্রণাক্রিষ্ট শিশুরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে, তাদের কপালে বিঁধে আছে মিসাইলের তীক্ষ্ণ শ্র্যাপনেল। না, CNN এ এসবের কিছুই দেখায়নি। মেরিন সেনারা হাদীসা শহরে ২৪ জন ঘুমন্ত মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ৭৬ বছর বয়স্ক হুইল চেয়াওে বসা এক বৃদ্ধ, আরও ছিল বিছানাতে ঘুমন্ত নারী এবং শিশু।

আমি আরো জানলাম, এক চৌদ্দ বছরের ইরাকি বালিকার কথা। বোন আবির আল-জানাবি। তাকে পাঁচজন আমেরিকান সেনা গণধর্ষণ করে। তারপর তাকে ও তার পরিবারের সকলকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। পাষন্ডরা তাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আমি আপনাদের একটা বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। একজন মুসলিম নারী কখনও তার একটি চুল পর্যন্ত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে না। অথচ একটি বার কল্লনা করে দেখুন, রক্ষণশীল পরিবারের এই ছোট্ট মেয়েটির কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পাশবিকভাবে তাকে যৌন নির্যাতন করেছে, একজন-দুজন নয়, পাঁচ সৈনিক মিলে। এই আজও, আমি কারাগারে বসে পাকিস্তান, সোমালিয়া আর ইয়েমেনে আমেরিকার চলমান ডোন হামলার খবর শুনছি। এইতো গত মাসেই, শুনলাম ১৭ জন আফগান মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এরপর তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এদের বেশিরভাগ ছিলেন মা এবং তাদের ছোট্ট সন্তানরা।

এগুলো হয়তো আপনার কাছে নিছক পত্রিকার খবর বৈ কিছু নয়।

কিন্তু এই আমি, এ থেকে শিখেছি, ইসলামের আনুগত্য আর ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞাটুকু। প্রতিটা মুসলিম নারী আমার বোন, আর প্রতিটা মুসলিম পুরুষ আমার ভাই, আর এই আমরা একসাথে একটা বিশাল পরিবার; যারা একে অপরকে সাহায্য করে যাব। অন্যভাবে

বলতে গেলে, আমি আসলে আমার ভাইবোনদের উপর এমন নির্বিচার অত্যাচার দেখে চুপ বা “নিষ্ক্রিয়” থাকতে পারিনি। শোষণের জন্য সহানুভূতি আমার সবসময়ই ছিল, কিন্তু আজ যেন ব্যাপারটা একদমই ব্যক্তিগত। যারা আমার ভাই-বোনদের হয়ে লড়ছে তাদের প্রতি আমার সম্মানও তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত।

আমি পল রিভিয়ারের কথা উল্লেখ করেছি। একদিন বৃটিশ হানাদাররা স্যাম এডাম্‌স ও জন হ্যানকককে গ্রেফতার করতে এবং মিনিটম্যানদের অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে লেক্সিংটনে আসছিল। আগাম এই খবর পেয়ে সেদিন পল রিভিয়ার ঘোড়ায় চেপে মধ্যরাতে লোকদেরকে সতর্ক করতে বেরিয়ে যান। ফলে কনকর্ডে গিয়ে বৃটিশ সেনারা মুখোমুখি হয় ভিন্ন দৃশ্যের। মিনিটম্যানরা বৃটিশ অভিযানের আগাম বার্তা লাভ করে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের জন্য। বৃটিশরা সে যুদ্ধে পরাজিত হয়, আর এ বিজয়ের হাত ধরে আসে আমেরিকান রেভ্যুলেশন। জেনে অবাক হবেন যে, মিনিটম্যানরা সেদিন যা করেছিল আমি সেই ঘটনাকে একটি আরবি শব্দ দিয়ে অতি সহজে ব্যাখ্যা করে দেবো। তা হলো—জিহাদ। আর এটা নিয়েই আমার আজকের এই বিচার।

আমার বিরুদ্ধে হয়তো আপনারা জঙ্গিদের বক্তব্য এবং ভিডিও অনুবাদের অভিযোগ শুনেছেন। শুনেছেন শিশুতোষ এবং হাস্যকর অভিযোগ, ওহ! সে তো ঐ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেছে। ওহ! সে তো এই বাক্যটা এডিট করেছে, এর সবই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে, তা হলো বৃটিশরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যা করেছিল ঠিক একই কাজ আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে করায় যেসব মুসলিমরা রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের সমর্থন করা। আমার ব্যাপারে আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে এটা জলের মতো পরিষ্কার, আমি কখনই শপিং

আজ থেকে আড়াইশ বছর
আগে এই রাস্তায়
আমেরিকানরা বৃটিশ
সৈন্যদের হাতে যেভাবে
নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক
একই বাস্তবতার শিকার
আজ মুসলিমরা, তবে
এবার আমেরিকান
সৈন্যদের হাতে।

মলে আমেরিকান হত্যার পরিকল্পনা করিনি। এগুলো একেবারেই পাতানো অভিযোগ। সরকারদলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলোই এমন অভিযোগের বিপরীতে কথা বলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে আমার লেখা ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অভিযোগের পক্ষে কিছুই বের করতে পারেননি। পরে আমি যখন মুক্ত হলাম, তখন সরকার আমার কাছে ছদ্মবেশী চর প্রেরণ করে একটি “সন্ত্রাস পরিকল্পনা”র সাথে যুক্ত হবার প্রস্তাব পাঠায়। সাজানো নাটক তৈরি করে সরকার আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাতে সাড়া দিইনি। রহস্যজনকভাবে, বিচারকরা এই ঘটনাটি যেন শোনেইনি।

যাইহোক, আমার বিরুদ্ধে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তা মুসলিম দ্বারা আমেরিকার নাগরিক হত্যা নিয়ে নয়, বরং তা আমেরিকান কর্তৃক মুসলিম হত্যার বিরোধিতা করার কারণে। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিমদেরকে অবশ্যই হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে, হোক সে হানাদাররা সোভিয়েত বা আমেরিকা কিংবা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত। আমি এটাই বিশ্বাস করি, আমি সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করতাম এবং সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করে যাবো (ইনশা আল্লাহ)। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, এটা চরমপন্থা নয়। এটা নিছক আত্মরক্ষা, নিজের মাটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা।

আমি আমার আইনজীবীদের সাথে এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি যখন তারা বলে, “সবাই তোমার এই

বিশ্বাসের সাথে একমত হবে এমনটা নয়।” আমি বলি, না, এটা যার যার-তার তার বিষয় নয়। যার সামান্য কান্ডজ্ঞান ও মানবতাবোধ আছে, আমার সাথে সে এই বিষয়ে একমত না হয়ে পারে না। কেউ যদি আপনার বাসায় ডাকাতি করতে আসে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন করে, কমনসেন্স বলে আপনার উচিত ডাকাতকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু যখন সেই ভূমি হয় “মুসলিম ভূমি” আর আক্রমণকারী বাহিনী হয় “আমেরিকান সেনাবাহিনী” তখন কেন যেন সব নীতিনৈতিকতার মাপকাঠি উল্টে যায়! নিজেদের রক্ষা করা তখন সন্ত্রাসবাদ আর আকাশ-সাগর পাড়ি দিয়ে আসা হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজ দেশকে রক্ষা করতে যারা যুদ্ধ করে, তারা হয় সন্ত্রাসী, তারা হয় খুনী, আমেরিকান হত্যাকারী!

আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে এই রাস্তায় আমেরিকানরা বৃটিশ সৈন্যদের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক একই বাস্তবতার শিকার আজ মুসলিমরা, তবে এবার আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। যখন সার্জেন্ট বেল্‌স নিরীহ আফগানদেরকে হত্যা করেছিল তখন আমি দেখলাম, সবাই কেবল তাকে নিয়ে ব্যস্ত, মিডিয়াতেও কেবল তার জীবনের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। তার পারিবারিক জীবন, তার মানসিক চাপ, তার বন্ধককৃত বাড়ি, তার PTSD নিয়ে বিস্তারিত খবর দেখানো হলো। পুরো ব্যাপারটায় তার জন্য এমনভাবে একটা সহানুভূতি তৈরি করা হয়, যেন সে-ই ভুক্তভোগী! যাদেরকে সে নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতিই দেখানো হয়নি! যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। যেন আফগান মুসলিমরা মানুষ নয়! দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই মানসিকতা আমাদের সবাইকে গ্রাস করেছে। এমনকি আমার আইনজীবীদের তাদের বন্ধ চেতনার খোলস থেকে বের করে এনে, “মুসলিমদেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে” -এই সামান্য

ব্যাপারটা আলোচনা করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আমার পাক্কা দু'বছর সময় লেগেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে আমার সাথে একমত হয়েছে। দু'বছর! এই ঘাঘু আইনজীবীদের কাজ আমাকে রক্ষা করা। মুসলিমদের আত্মরক্ষাকে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এই আইনজীবীদেরই সময় লেগেছে দুই বছর! আর সেখানে আমাকে যেকোনো একজন বিচারকের সামনে দাঁড় করিয়ে যখন বলা হয়, “এই বিচারক নিরপেক্ষ, তোমার সমমনা।” আমি তখন বলি, রাখুন আপনার নিরপেক্ষতা। আমেরিকাকে আজ যে মানসিকতা গ্রাস করে নিয়েছে তাতে আমার মতের পক্ষে কোনো উকিল বা বিচারক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা আমার সহজ কথাগুলো সহজভাবে বুঝবে। তাই সরকারও আমার উপর মামলা খুলিয়ে রেখেছে। এটা করা যে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল তা নয়। কিন্তু আসলে তারা দেখাল যে তারা চাইলেই এমনটা করতে পারে।

ইতিহাসের ক্লাস থেকে আমি আরো একটা বিষয় শিখেছি, আমেরিকা হলো সেই দেশ যারা ঐতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের অন্যায়গুলোকে আইনগত বৈধতা দিত। আবার পরবর্তীতে তারাই অবাক হয়ে ভাবতো—আরে, আমরা এমন ছিলাম! দাসত্ব, বৈষম্যমূলক জিম ক্রো আইন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বন্দিশিবিরে অন্তরীণ রাখা—এই সবগুলো কাজকেই আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সুপ্রীমকোর্টও এই বৈষম্যমূলক আইনগুলোকে বছরের পর বছর লালন করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে আমেরিকা তার চেহারা পরিবর্তন করেছে। তারা নিজেদের অতীতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়—আরে, আমরা বুঝি এমন ছিলাম! নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধরুন, তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সন্ত্রাসী গণ্য করত। তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তিতে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বদলেছে বিশ্বের চেহারা,

মানুষ জানতে পেরেছে আসলে সরকারই ছিল সন্ত্রাসী, ম্যান্ডেলা নয়। ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হলেন। তাই আসলে সবকিছুই আপেক্ষিক। যে যেভাবে চায়, সেভাবেই সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের সংজ্ঞায়িত করে। এই সংজ্ঞাগুলো নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র আর সেই সময়ের ক্ষমতাধর পরাশক্তিগুলোর উপরে। কেননা তারাই নিজেদের মতো করে এসব সংজ্ঞা বানায়।

হ্যাঁ, আপনার চোখে আজ আমি একজন সন্ত্রাসী। আমি এখন জেলখানার কমলা রঙের একটা পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছি। এই পোষাকেই হয়তো আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেবো। এটাই আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে। বদলে যাবে এর মানুষগুলো। তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কী প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কীভাবে হাজার হাজার মুসলিম খুন হয়েছিল, পঙ্গু হয়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে। কিন্তু ‘হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র’ কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই। কারণ আমি সেইসব মুজাহিদ্দীনদের সমর্থন করেছিলাম, যারা প্রকৃতপক্ষে ‘হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র’ থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। একদিন আমেরিকানরা দেখবে, আমাকে সন্ত্রাসী বানাতে সরকার কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। যদি বোন আবির আল-জানাবিকে মৃত থেকে জীবিত করে ফিরিয়ে এনে আমেরিকানদের দ্বারা গণধর্ষণের সময় তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, “বলো তো, সন্ত্রাসী কারা?” আমি নিশ্চিত, সে আমার দিকে আঙ্গুল তাক করত না।

সরকার বলছে সহিংসতায় আমার মন নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে! আমেরিকানদের হত্যা করার জন্য আমি নাকি পাগল হয়ে আছি! একজন মুসলিম হিসাবে বর্তমান সময়ে এর চেয়ে হাস্যকর মিথ্যা আমি কল্পনা করতে পারছি না।

২৪ পৃষ্ঠার পর

আবু তুফায়েল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে গোপনে যা জানিয়েছেন সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন। তিনি বললেন, মানুষের নিকট গোপন রেখেছেন এমন কিছুই তিনি আমার নিকট একান্তে বলেননি। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে আল্লাহ তাকে লানত করেন।^১

যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কুরবানি করা তাওহীদের বিপরীত, সুতরাং এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বছর কুরবানির এ দিন ফিরে এসে আমাদেরকে তাওহীদের এ শিক্ষাই দিয়ে যায় যে, আমরা তাঁরই বান্দা। সুতরাং আমাদেরকে তাঁর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক করা যাবে না। আর এজন্য যদি আমাদের প্রাণও উৎসর্গ করতে হয়, তাহলে সেজন্যও আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। মিল্লাতে ইবরাহীমের সেই দৃঢ় চেতনার দিকেই আমাদের আহ্বান করে যায়।

(Footnotes)

^১ তাফসীরে বাগাভী ও খায়েন, ৬/২৪ পৃঃ; তাফসীরে মাযহারী, ৮/১৩১ পৃঃ।

^২ তিরমিযী, হা/১৫০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৯৫৫; মিশকাত, হা/১৪৭৫; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

^৩ ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৫৬; দার কুতনী, হা/৪৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৭৫৬৬; জামেউস সগীর, হা/১১৪৩৬।

^৪ সহীহ মুসলিম, হা/৫২৪০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৫৫; মুসনাদুল বাযযার, হা/৪৯৫; সুনানুল কুবরা লিন নাসাই, হা/৪৪৯৬; মুসনাদে আবু ই'আলা, হা/৬০২; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হা/৬৩২২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৭২৫৪; মিশকাত, হা/৪০৭০।



কুরবানির উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

শাইখ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা :

কুরবানি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَسْأَلُ
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

আল্লাহর নিকট তাদের গোশত ও রক্ত কিছুই পৌঁছায় না, বরং পৌঁছায় কেবল তোমাদের তাকওয়াটাই। (সূরা হাজ্জ- ৩৭)

জাহেলি যুগে আরববাসী দেব-দেবী ও মূর্তির জন্য যেসব পশু কুরবানি করতো সেসব পশুর গোশত কাবা ঘরের সামনে এনে রাখতো এবং রক্ত এর দেয়ালে লেপ্টে দিত। এর মাধ্যমে তারা মনে করত যে, এগুলো আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করে থাকেন। অথচ তাদের কুরবানিগুলো তাদের দেব-দেবীদের নামে প্রদান করতো। অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুরবানির আসল উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

অতএব কুরবানি কেবল উল্লেখিত উদ্দেশ্যেই প্রদান করা উচিত। অন্যথায় কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা সামাজিক প্রচলন হিসেবে কুরবানি করে তাহলে তার কুরবানি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা :

পশু যবেহ করা মূলত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্ট বহু প্রাণীকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তাদের পিঠে চড়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করি, তাদের সাহায্যে চাষাবাদ ও মাল পরিবহণ করি, তাদের গোশত খাই, দুধ পান করি এবং তাদের চামড়া, পশম, রক্ত, হাঁড় ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের

অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা হাজ্জ- ৩৬)

মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয়, তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তা আল্লাহর নামে কুরবানি করা উচিত।

৩. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা :

কুরবানি করার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা। কেননা আমাদের অধীনে থাকা জীবজন্তুগুলোকে তিনিই পোষ মানানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অন্যথায় এ বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَٰذَاكُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾

এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা হাজ্জ- ৩৭)

৪. আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান দেখানো :

কুরবানি করার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান দেখানো। নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে স্মরণ হয় এমন বস্তু বা স্মৃতিচিহ্ন যেমন বাইতুল্লাহ বা কাবাঘর, সাফা-মারওয়া, মসজিদ, কুরবানির জন্য চিহ্নিত জন্তু, হজের স্থানসমূহ ইত্যাদি। এসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকায়িত তাকওয়ার ফলেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ
الْقُلُوبِ﴾

যদি কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করে, তবে এটা তো তার অন্তরের তাকওয়া মাত্র। (সূরা হাজ্জ- ৩২)

কুরবানির ইতিহাস

পৃথিবীর বুকে প্রথম কুরবানি :

আদম (আ.) এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনুল

এরপর ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য তৈরি হলেন এবং স্ত্রী হাজেরাকে বললেন, ছেলেটাকে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দাও। তারপর পুত্রকে নিয়ে কুরবানির স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ও তাফসিরকারক বলেন, এ সময় শয়তান তিনবার ইবরাহীম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন। তার ঐ কংকর নিক্ষেপের স্মৃতি আজও প্রতি বছর হজের সময় পালন করা হয়।

কারীমে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন,

﴿وَإِذْ قَرَّبْنَا قُورْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾

তুমি তাদেরকে সঠিকভাবে শোনাও আদমের দুই পুত্রের বিবরণ। যখন তারা কুরবানি করেছিল তখন একজনের কুরবানি কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানি কবুল করা হয়নি। (সূরা মায়েদা- ২৭)

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব আদম (আ.) এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম কুরবানির সূত্রপাত হয়। আর তারা এ ঘটনাটি সংঘটিত করেছিল তাদের একটি বোনকে কেন্দ্র করে। তখনও মানবজাতির বিস্তার ঘটেনি বিধায় আদম ও হাওয়া (আ.) এর ঔরসে জোড়া জোড়া সন্তান জন্মগ্রহণ করত। যার একটি হতো মেয়ে সন্তান, আর অপরটি হতো ছেলে সন্তান। পেটের পার্থক্য করে বাবা আদম ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিতেন। এই হিসেবে কাবিল পায় হাবিলের সাথে জন্মগ্রহণকারী বোনটি, যেটি ছিল তুলনামূলক কালো; আর হাবিল পায় কাবিলের সাথে জন্মগ্রহণকারী বোনটি, যেটি ছিল পরমা সুন্দরী। হাবিল এই ফায়সালা মেনে নিলেও কাবিল এই ফায়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাবা আদম তাদেরকে কুরবানি করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যার কুরবানি কবুল হবে তাকে সেই বিবাহ করবে। সে যুগে কুরবানি কবুল হওয়া বা না হওয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যেতো। যার কুরবানি কবুল হতো তার

কুরবানিকৃত বস্তুকে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে জ্বালিয়ে দিতো। পক্ষান্তরে যার কুরবানি কবুল হতো না তার কুরবানি সেভাবেই পড়ে থাকত এবং আগুন সেটাকে স্পর্শ করত না। অতঃপর এরই প্রেক্ষিতে উভয়ে কুরবানি করে।

প্রত্যেক যুগেই কুরবানির প্রচলন ছিল :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَّا ۖ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ﴾

আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানির ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে ঐ সকল হালাল চতুষ্পদ জন্তুর উপর, যা তিনি তাদেরকে রিযিক হিসেবে দান করেছেন। (সূরা হাজ্জ- ৩৪)

কুরবানি ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাহ :

এটা মহান রবের একটা সুন্নাহ যে, তিনি যাকে সম্মানিত করতে চান- তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে সে কাজের জন্য উপযুক্ত করে নেন। সেহেতু ইবরাহীম (আ.) এর পুরো জীবনটাই ছিল আল্লাহর পরীক্ষায় ঘেরা। প্রথমত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। শেষ বয়সে তাঁর একান্ত দুআর ফলে আল্লাহ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ফেলেন এই সন্তানের মাধ্যমে। হুকুম আসে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কুরবানি করার। কুরআনের বর্ণনা-

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾

তারপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললো, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি; এখন তুমি বলো, তোমার

মতামত কী? (৩৭: ১০২)

ইসমাইল (আ.) ছিলেন একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল সন্তান। তিনি পিতার অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং এও জানতেন যে, নবীদের স্বপ্ন সবই সত্য তথা আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে স্বপ্নে যা কিছু দেখান, তাই তাঁর আদেশ। তাই তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উত্তর প্রদান করলেন,

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾

হে পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণ করুন। আল্লাহ যদি চান তবে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন। (৩৭: ১০২)

এরপর ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য তৈরি হলেন এবং স্ত্রী হাজেরাকে বললেন, ছেলেটাকে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দাও। তারপর পুত্রকে নিয়ে কুরবানির স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ও তাফসিরকারক বলেন, এ সময় শয়তান তিনবার ইবরাহীম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন। তার ঐ কংকর নিক্ষেপের স্মৃতি আজও প্রতি বছর হজের সময় পালন করা হয়।

এরপর যখন ইবরাহীম (আ.) গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন কুরবানির জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিলেন। এমনকি পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন এবং ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন- এমন সময় আল্লাহ তাআলা তার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে তার স্থলে অন্য একটি জন্তু পাঠিয়ে দিলেন এবং পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে বাঁচিয়ে দিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি তার বংশধর ও পরবর্তী উম্মতের জন্য রীতি হিসেবে রেখে দেন। আর এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বড় ধরনের পরীক্ষা। ইবরাহীম (আ.) এ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সাথে সাফল্য অর্জন করেন। ফলে আজও প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাহ হিসেবে আল্লাহর হুকুম পালন করে আসছে। কুরআনের ভাষায়,

কুরবানি একটি
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত
এবং আল্লাহর নৈকট্য
অর্জন করার অন্যতম
মাধ্যম। এতে
ইবরাহীম (আ.) এর
সুন্নত আদায় করা হয়
এবং আমাদের প্রিয়নবী
মুহাম্মাদ (সা.) এর
সুন্নতও প্রতিপালিত হয়

অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য
প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত
করে শোয়ালো তখন আমি তাকে ডেকে
বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে
সত্যে প্রমাণ করে দেখালে। এভাবেই
আমি খাঁটি বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে
থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল এক সুস্পষ্ট
পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম
এক মহান যবেহের বিনিময়ে। আর
আমি তার জন্য এ বিষয়টি ভবিষ্যৎ
বংশধরদের মধ্যে কায়েম রাখলাম।
(৩৭: ১০৩-১০৮)

“প্রিয় জিনিস কুরবানি দাও” এ কাহিনী
সঠিক নয় :

ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে যখন কুরবানির
নির্দেশ পান তখন তাকে স্বপ্নে কী
নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? এ ব্যাপারে
জাহেল বক্তা ও জনগণের মধ্যে
প্রচারিত আছে যে, ইবরাহীম (আ.)-কে
নাকি বলা হয়েছিল যে, তুমি তোমার
প্রিয়বস্তুকে আল্লাহর রাহে কুরবানি
করো। ফলে তিনি তিনদিনে তিনশো
উট কুরবানি করেন। তারপরে তিনি
আবার তার প্রিয়বস্তু কুরবানির করার
নির্দেশ পাওয়ায় তিনি বুঝতে পারলেন
যে, প্রিয়বস্তু বলতে তার একমাত্র পুত্র
ইসমাইলকেই কুরবানি করতে বলা
হয়েছে। তাই তিনি সবশেষে স্বীয়
পুত্রকে কুরবানি করতে সচেষ্ট হন।

‘তুমি তোমার প্রিয়বস্তুকে আল্লাহর রাহে
কুরবানি করো’ এ কথাটি কুরআনের
কোথাও নেই এবং কুরআনের
নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরেও এ
বাক্যটির উৎস পাওয়া যায় না।

যারা ঐ কথাগুলো বলে বেড়ান তারা

কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে বলেন
না। কুরআন স্পষ্ট বলছে, তিনি স্বপ্নে
দেখেন যে, স্বীয় পুত্রকেই যবেহ
করছেন। তাছাড়া মুফাসসিরগণও
বলেছেন যে, তিনি পরপর তিনটি
রাতেই স্বপ্নে দেখেন যে, স্বীয় পুত্রকে
যবেহ করছেন। তাহলে প্রিয় বস্তু
কুরবানি করার কথা এলো কোথা
থেকে?

কুরবানি মুহাম্মাদ (সা.) এর সুন্নাহ :
কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত এবং
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম
মাধ্যম। এতে ইবরাহীম (আ.) এর
সুন্নত আদায় করা হয় এবং আমাদের
প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সুন্নতও
প্রতিপালিত হয়। কারণ এ কুরবানি নবী
(সা.)ও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার
বাণী,

﴿فَضْلَ لِرَبِّكَ وَانْحَزْ﴾

অতএব তুমি নামায কায়েম করো এবং
আমারই উদ্দেশ্যে কুরবানি করো।
(কুরআন, ১০৮: ২)

মক্কায থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর
জন্য এ আদেশটি পালন করা ছিল খুবই
কষ্টকর। কিন্তু মদিনায় যাওয়ার পর
আল্লাহর ইচ্ছায় যখন মুসলমানরা
নিরাপত্তা লাভ করল তখন থেকে
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি বছর কুরবানি
করতেন। হাদীসে এসেছে,

بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ মদিনায়
অবস্থানকালীন দশ বছর কুরবানি
করেন।^{১২}

কুরবানির হুকুম :

কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে
হাদীসে এর গুরুত্ব অনুপাতে আলেমগণ
কুরবানিকে ওয়াজিব তথা অবশ্য
পালনীয় কাজ হিসেবে মনে করেন।
যেমন এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ
سَقَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحُزُّ مَضِلًّا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি
কুরবানির সামর্থ রাখে অথচ কুরবানি
করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের
নিকটেও না আসে।^{১৩}

সুতরাং কোন সামর্থবান মুসলিমের

পক্ষে কুরবানি ত্যাগ করা কোনক্রমেই
উচিত হবে না।

কুরবানির শিক্ষা

প্রতি বছর কুরবানির দিন আগমনের
মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় শিক্ষা দিয়ে যায়। যেমন-

১. ইখলাস অর্জন করা :

কুরবানি দ্বারা মূলত আল্লাহর জন্য
বান্দার অন্তরের ইখলাস পরীক্ষা করা
হয়। কেননা আল্লাহ এ কুরবানির পশু
থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করেন না; বরং
তিনি বান্দার অন্তরের ইখলাসের দিকেই
লক্ষ্য করেন। ইখলাসের বিশুদ্ধতা ছাড়া
কুরবানি করা নিছক পশু জবাই আর
গোশত খাওয়া ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ
তাআলা বলেন,

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾

আল্লাহর নিকট তাদের (কুরবানির
পশুর) রক্ত-মাংস (কোনকিছুই) পৌছায়
না, বরং পৌছায় কেবল তোমাদের
তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ- ৩৭)

এজন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল
কাজকর্ম একনিষ্ঠভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে
করার আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ﴾

বলো, আমার নামায, আমার কুরবানি,
আমার জীবন ও আমার মরণ সবই
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই
উদ্দেশ্যে (নিবেদিত)। তাঁর কোন
শরীক নেই এবং আমি এজন্যই আদিষ্ট
হয়েছি; আর আমিই প্রথম মুসলিম।
(সূরা আনআম- ১৬২, ১৬৩)

২. তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া :

আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্য
কাউকে অংশীদার করা তাওহীদের
বিপরীত। সুতরাং কুরবানির ক্ষেত্রে
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য নেয়া
হারাম। তাছাড়া অন্যান্য যে কোন
ধরনের যবেহের ক্ষেত্রেও এ হুকুম
প্রযোজ্য। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَخْبَرْنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - فَقَالَ مَا
أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়



তারেক মেহান্না প্রেরণার বাতিঘর

৩০ বছর বয়সী ড. তারেক মেহান্না একজন উচ্চশিক্ষিত ইজিপ্সিয়ান-আমেরিকান মুসলিম। তিনি ম্যাসাচুসেটস কলেজ অফ ফার্মাসি এন্ড হেলথ সায়েন্স থেকে ফার্মাসির উপর পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি একজন প্রাকটিসিং মুসলিম এবং স্থানীয় ইসলাম ও আন্তঃধর্ম সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তিত্ব। একইসাথে ভাই, শিক্ষক, নেতা, বিদ্বান এবং বন্ধু হিসাবে সমাজের প্রতি তার অনস্বীকার্য অবদান তাকে সম্মানের এই আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। পরিচিতজনেরা একজন বিনয়ী, শান্ত, আন্তরিক, শান্তিপ্রিয়, ব্যক্তিত্ববান, জ্ঞানী এবং একনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তারেকের বর্ণনা দিয়ে থাকেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারেকের কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার। মুসলিম বন্দীদের মুক্তির দাবিতেও তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী এবং কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি তার মূল্যবোধের সাথে আপোস করতে সম্মত হননি। কয়েক বছর ধরেই তারেক এফবি আই'র নজরদারী এবং হয়রানির শিকার ছিলেন। একজন রাজনৈতিকভাবে সচেতন স্পষ্টবাদী মুসলিম নেতা হওয়াই ছিল এই হয়রানির কারণ। তার প্রতিবাদী কণ্ঠ নিশ্চূপ করে দিতে এবং তাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এফবি আই তাকে গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। ন্যায়পরায়ণ তারেক নিজের সমাজের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাব মেনে না নিলে এফবি আই তার বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দিতে থাকে। আর এর পরিণতিতেই ২০০৮ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এরপর ২০০৯ সালের ২১ অক্টোবর পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

২০০৯ এ গ্রেফতারের পর দু'বার তারেকের জামিনের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। বিচারের অপেক্ষায় প্লাইমাউথ কাউন্টি কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে দৈনিক ২৩ ঘন্টার নিঃসঙ্গ কারাবাসে (Solitary Confinement) তিনি দুই বছরের বেশি সময় কাটান।

অবশেষে ২০১১ সালের ২৭ অক্টোবর তারেকের বিচার শুরু হয় এবং দুই মাস ধরে চলে। ২০ ডিসেম্বর তার প্রতি আরোপিত সাতটি মামলাতেই তাকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল তাকে সাড়ে সতের বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি টেরা হটে সি এম ইউ (Terre Haute CMU)তে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় সাজা ভোগ করছেন।

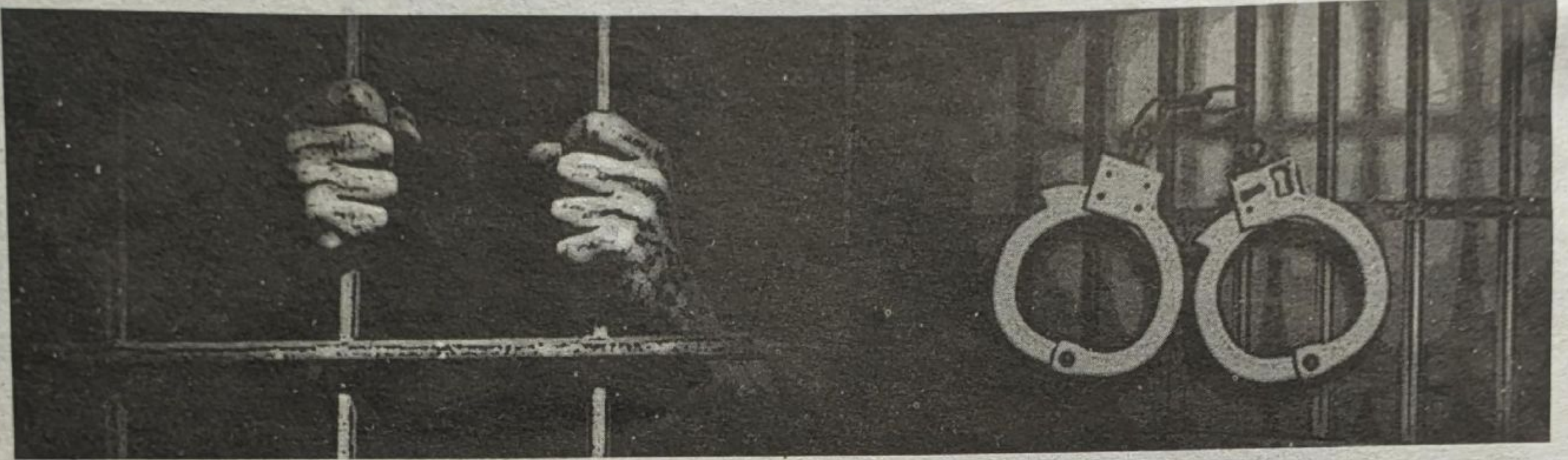
কিন্তু কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেও তিনি ভুলে যাননি উম্মাহর কথা। সেখান থেকেও চালিয়ে যাচ্ছেন চেষ্টার পর প্রচেষ্টা, যেন উম্মাহ জেগে উঠে। সোচ্চার হয় নিজ অধিকার আদায়ে। স্বজাতিকে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন- বাঁচতে হলে সম্মানের সাথে বাঁচুন। অধিকার নিয়ে বাঁচুন। গোলামির মানসিকতা ছাড়ুন। মানুষ হয়ে মানুষের গোলামি করার চেয়ে ন্যাকারজনক ঘটনা আর কী হতে পারে? মস্তক অবনত করুন আল্লাহর সামনে- গোটা দুনিয়া আপনার পদাবনত হবে।

আমরা আমাদের পত্রিকা ও পেজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মূল লেখাগুলো সব আমাদের হাতে নেই। কেউ সংগ্রহ বা অনুবাদ করে দিলে তার প্রতিদান মহান রবের কাছেই। আর তিনিই সর্বোত্তম প্রতিদানদাতা। লেখা মেইল করতে পারেন অথবা আমাদের পেজে সেভ করতে পারেন।

alburqan2015@gmail.com

www.facebook.com/alburqan

লোহার শিকলে নয় আমার অস্বস্তি তোমাদের নির্মম লজ্জাহীনতায় বান্দা রেজা



ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে
আমি মিশরেও দেখেছি,
তুর্কিতেও দেখেছি; এরা
শুধু তাদের আম্রিকি
প্রভুদের খুশি রাখতে
কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই
আমাদের জঙ্গি-সন্ত্রাসীসহ
কত কিছু বলে বেড়ায়।
আমরা নাকি হেন করি,
তেন করি। আরে ব্যাটারা
তোদের আম্রিকি প্রভুরা
কী করে? তারা কি ডোন
থেকে ফুলের মালা আর
গোলাপজল ছিটিয়ে
বেড়ায়? কই, তাদের
বিরুদ্ধে তো কথা বলার
মতো মেরুদণ্ড দেখি না!

রেজাউল কবীর। একজন বাংলাদেশি প্র্যাকটিসিং মুসলিম। পেশায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। লেখালেখি করেন। কথা বলেন ইসলামের পক্ষে। ২০১২ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী এরপর থেকে তাকে নানাভাবে হেনস্থা করে এবং প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে এক বছর কারাগারে আটকে রাখে। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত আছেন। সম্ভ্রতি তিনি নবীজি (সা.) এর জীবনীর উপর ৬০ পর্বের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও-লেকচার নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। বাংলা ভাষায় সিরাতের উপর এটিই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ভিডিও লেকচার। এছাড়াও তিনি ইসলামকোষ নামের একটি প্রজেক্ট পরিচালনা করছেন, যা হবে বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম অনলাইন ইসলামিক এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ (ইনশা-আল্লাহ)। রেজাউল কবীর এমন একজন মানুষ যিনি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখান। মুসলিম ভাইবোনদের মাঝে তিনি “বান্দা রেজা” নামেই বেশি পরিচিত।

- স.স

কেরানি টাইপের কিছু লোক আছে। মাথা সবসময় তেল চিটচিটে, পরিপাটি আঁচড়ানো। মধ্যবিত্ত পরিবারের, মিনমিনে, শান্তশিষ্ট। অদৃশ্য কোনো এক কারণে বসদের সামনে কখনোই পিঠটা সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। কথা এত নিচু স্বরে বলে যে, প্রায় শোনাই যায় না। অথচ যখন শুনি ওই একই লোক ঘরের বউকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলেছে- তখন বলুন তো কেমন লাগে!?

আমাদের মতো নিম্ন-মধ্য আয়ের

দেশগুলোরও ঠিক একই অবস্থা। প্রশাসনের দিকেই দেখুন। নিজের দেশের মানুষের সামনে এদের তর্জন-গর্জন শুনে মনে হয়, এরা কয়েক হাজার বছর ধরে দাপটের সাথে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অঞ্চল শাসন করে আসছে। অথচ এদের অফিসাররা যখন খুচরো কিছু ডলারের লোভে বিভিন্ন দেশে ইউএন মিশনে যায় তখন সেখানে ধলা সৈন্যদের ফুর্তি করার জন্য নির্ধারিত ক্লাবের দরজায় উঁকি দিতেও ভয়ে এদের গলা থেকে

নাভি পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। পশ্চিমা প্রভুদের সামান্য গলা খাঁকারিতেই এদের প্যান্টটাকে শুকনো রাখা দায় হয়ে যায়; অথচ নিজের দেশের মানুষের পিঠে চাবুক চালানোর সময় নিজেদের চেহারা আলােকজান্ডার নট সো গ্রেটের কাল্পনিক আভিজাত্যের একটা ভাব ফুটিয়ে রাখে।

আমার মনে আছে, বাংলাদেশের উর্ধ্বতন অফিসারদের একজন খুব ভাব নিয়ে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। আপাতত নাম উল্লেখ করে তাকে সেলিব্রেটি বানাতে চাচ্ছি না। সেদিন আমার চোখ ছিল বাঁধা। দু হাতেই লোহার শৃঙ্খল। তিনি আমাকে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সাথে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছিলেন আর আমেরিকানদের সামনে বিভিন্ন কায়দায় নিজের অতি উচ্চ ব্যক্তিত্ব জাহির করার হাস্যকর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনলাম। এবার আমার পালা। খুবই শান্তভাবে বললাম, Your position is not fit to talk to a soldier like me, Officer.

চোখ বাঁধা অবস্থাতেও বুঝতে পারছিলাম, ভদ্রলোক বিরাট ধাক্কার মতো খেয়েছে। তার কণ্ঠস্বর পুরাই আউলা খেয়ে গেছে। হাক্কা পিণ্ডি জ্বলা গন্ধও পেলাম। ভদ্রলোক কিছুটা সামলে নিয়ে চট করে তুমি থেকে আপনিতে উঠে আসেন এবং বলেন, আপনার কি কোনো ধারণা আছে? You have no idea about my position.

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলাম, Yes I do, আমার সামনে বসে থাকা আপনার এইসব সাদা প্রভুরা ধমক দিলে আপনি পেশাব আটকে রাখতে পারেন না। This is your Position!

কণ্ঠস্বরে আরও এক প্রলেপ গান পাউডার মিলিয়ে বলি, My fight is against your white lord and you are not even eligible to be my enemy. So step aside and let your American lord talk to me man to man.

ভদ্রলোক তোতলাতে তোতলাতে

বলেন, ইলিউশন কি জিনিস জানেন? আমি বলি, জী! জানি, যে জিনিসের মধ্যে আপনি হাবুডুবু খাচ্ছেন।

রুমের কেউ একজন ফিক করে হেসে দেয়ায় ভদ্রলোক বিরাট লজ্জায় পড়ে গেলেন। অন্য একজন অফিসার দ্রুত বিষয়টাকে সামাল দেয়ার জন্য আমাকে বলেন, ভাল বলেছেন। কিন্তু এখন আমরা একটা ব্রেক নিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আবার বসবো।

মনে হলো তিনি তার অফিসারকে কিছুটা বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে বেচারার পিণ্ডি, কলিজাসহ যা কিছু ছিল সব পুড়ে ভস্ম! ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে রুম ত্যাগ করলেন। চেক মেট।

রুমের সবাই মনে হচ্ছিল একটা ফাইট দেখা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরাট হতাশ হয়েছে। ততদিনে আমিও বুঝে গেছি বেচারার অফিসারদের কর্মজীবনে একটাই মাত্র বিনোদন। আর তা হচ্ছে বড় কর্তাদের নির্মমভাবে অপদস্থ হতে দেখা। ওই দিনের পর ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আমি আর শুনিনি। মিডিয়াতে অবশ্য প্রায়ই তাকে দেখি আর সেদিনের কথা মনে করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি মিশরেও দেখেছি, তুর্কিতেও দেখেছি; এরা শুধু তাদের আফ্রিকি প্রভুদের খুশি রাখতে কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই আমাদের জঙ্গি-সন্ত্রাসীসহ কত কিছু বলে বেড়ায়। আমরা নাকি হেন করি, তেন করি। আরে ব্যাটারী তাদের আফ্রিকি প্রভুরা কী করে? তারা কি ডোন থেকে ফুলের মালা আর গোলাপজল ছিটিয়ে বেড়ায়? কই, তাদের বিরুদ্ধে তো কথা বলার মতো মেরুদণ্ড দেখি না!

আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন তারা ফিরিসিদের খুশি করতে নিজের জাতভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করছেন? জবাবে অফিসাররা আক্ষেপ করে বলেন, ভাই! আমরা হলাম চাকর। আমাদের কী করার আছে বলুন?

জী ঠিক 'চাকর' শব্দটাই তারা ব্যবহার করেছিলেন। আহ! স্বাধীনতার কী সাধ,

দেশের যে হাল, তাতে অনুমান করছি আমার পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো জেলের দেয়ালে আমার কিছু লিখা স্বচক্ষেই দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি, এই কথাটা এদেরকে ভিতরে ভিতরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। তাদের চেহারা তাদের অসহায়ত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। আর আমিও বিলাল (রা.) এর মতো ইচ্ছা করেই বারবার ডায়ালগগুলো বলে বলে তাদের কলিজা ভুনার গন্ধ শুকতাম।

এদের পচনধরা হৃদয় একটিবারের জন্যেও তা অনুভব করে দেখেনি। আমার হাতের লোহার শিকল আমাকে মুহূর্তের জন্যেও বন্দি করতে পারেনি। অথচ এদের লজ্জাহীনতা এদের এমনভাবে বন্দি করে রেখেছে যে এখান থেকে এদের কোনো মুক্তি নেই। আর আমিও ঠিক এ কারণেই বলেছিলাম, Your position is not fit to talk to a soldier like me. আপনারা চাকর হলে চাকরের মতো থাকুন। দয়া করে খামোখা অফিসারের ভাব দেখাবেন না। এসব কথা আমি পাবলিকলি প্রকাশ করছি বলে হয়তো এরা আমার বিরুদ্ধে আরো দশটা মিথ্যা মামলা দিতে পারবে। যেকোনো দিন আমাকে

ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর,
আল্লাহর রাসূলের এবং
আল্লাহওয়ালাদের জন্য।
মোল্লা উমরকে দেখেই
শিখুন না। সামান্য
স্যান্ডেল পরা কিছু সৈন্য
নিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে
মাথা উঁচু করে আছেন।
অথচ পৃথিবীর সবগুলো
পরশক্তি এবং তাদের
দোসররা মিলে দীর্ঘ এক
দশকেও তাকে বিন্দুমাত্র
ঝুঁকিতে পারেনি। এই
শক্তি ঈমানের, এই শক্তি
আত্মসম্মানের। এই শক্তি
বিবেকের, এই শক্তি
ব্যক্তিত্বের।
আমার লেখা পড়ে যদি
কিছুটাও লজ্জাবোধ জেগে
উঠে তবে ভাল কথা।
অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে
আপনাদের মিডিয়া,
লাঠিয়াল বাহিনী অথবা
কোর্ট-কাচারি যা কিছু
আছে ব্যবহার করতে
পারেন। আমার ইজ্জত
এবং নিরাপত্তা একমাত্র
আল্লাহর হাতে। আমি
আপনাদের সামনে মাথা
উঁচু করেই থাকব
বি-ইয়নিল্লাহ।

আবারও গুম করতে পারবে। আল্লাহ
চাহে তো আমাকে হত্যাও করতে
পারবে। কিন্তু যেটা ওরা কোনো দিন
পারবে না তা হচ্ছে- আমার চোখের
দিকে তাকিয়ে কথা বলতে।
ইনশা-আল্লাহ। বন্দি অবস্থায় আমি
বারবার এদেরকে বলেছি এবং বিভিন্ন
দেয়ালে লিখেও দিয়েছিলাম,

Jail me or kill me, you
won't stop fearing me;
Coz, I am Banda Reza and
I'm a Muslim.

দেশের যে হাল, তাতে অনুমান করছি
আমার পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো
জেলের দেয়ালে আমার কিছু লিখা
স্বচক্ষেই দেখার সুযোগ পেয়েছেন।
আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি, এই
কথাটা এদেরকে ভিতরে ভিতরে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত।
তাদের চেহারা তাদের অসহায়ত্ব
স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। আর আমিও
বিলাল (রা.) এর মতো ইচ্ছা করেই
বারবার ডায়ালগগুলো বলে বলে
তাদের কলিজা ভুনার গন্ধ শুকতাম।

এ তো গেল প্রশাসনের কথা। এবার
আসুন চেতনাবাজদের দেখি। এসব
দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা
ধারণকারীদের বিভিন্ন দেশের
এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন লাইন থেকে
শুধুমাত্র গরিব দেশের পাসপোর্টের
কারণে অন্যদের থেকে কান ধরে
আলাদা করে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে
দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অথচ খুবই
আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এরাই আবার
নিজেদের দেশ-জাতির প্রশংসায় একটি
বাংলাদেশ তুমি জাতি জনতার, সারা
বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহঙ্কার
টাইপের গীত রচনা করে! এসমস্ত
দেশ-জাতি নিয়ে কেউ কোনোভাবে
বিস্মিত কিনা জানি না, তবে ঠিক কোন
কারণে আমরা এধরনের বুলি
আওড়াচ্ছি সেটা ভেবে আমি নিজেই
যারপরনাই বিস্মিত!
নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে এদের বিরাট
হৈচৈ! অথচ মনে-প্রাণে এরা
একশ'ভাগ খাঁটি বলিউডি-হলিউডি।
চেতনার মুলা বেচা শুধু মঞ্চ আর
টকশোতেই। ঘরে ফিরেই রিমোট কিন্তু

হিন্দি সিরিয়ালে। রাজনীতি, আইন
আর দর্শনে এরা আপাদমস্তক
ভিনদেশি; ভাড়া করা মূল্যবোধ আর
কিনে আনা প্রযুক্তি পুরোপুরি বিদেশি
হলেও শ্লোগান কিন্তু বরাবরই স্বদেশি।
এসব দেশের নেতা-নেত্রীর চোয়াল
হলো সবচেয়ে অধিক প্রদর্শনযোগ্য
সামগ্রী। সর্বাসঙ্গজুড়ে কেবল চোয়ালটাই
অবশিষ্ট। চাপাবাজিতে যেমন এদের
কোনো জুড়ি নেই, কামড়া-কামড়িতেও
এদের কোনো তুলনা হয় না। এদের
কামড় যেমন বিষাক্ত, লেহনও তেমন
মোলায়েম। এরা নিজের জাতভাইকে
দেখামাত্রই শুরু করে ঘেউ ঘেউ;
সুযোগ পেলেই বসিয়ে দেয় কামড়।
এই কামড় আজীবনের, আমরণের।
অনন্ত, অবিরাম।

আবার বিদেশি প্রভুদের সামনে এদের
লেহন ক্ষমতা অপরিমেয়। সঙ্গে ল্যাঞ্চার
দুলানো একদম ফ্রি। প্রভুরা যত
জোরেই লাথি মারুক, এরা কাঁই
শব্দটিও করে না। প্রভুরা জিএসপি ধরে
ঝাঙ্কি দিলে বলে, নো-প্রবলেম ড্যাডি!
আর টিপাই মুখ টিপ্তা ধরলে কয়, ঠিকই
তো করেছেন দাদা! ফেলানিরে মারলে
কয়, ব্যাপার না, ফেলানিই তো! জয়
বাবা আর তারেক ভাইয়া তো আর
না!!!

আরে ব্যাটারা, যত বাহাদুরি আর
জারিজুরি আছে সব দেখাতে পারিস
নিজের দেশের মানুষের উপর! আম্রিকি
ড্যাডি আর ভারতীয় দাদাদের বেলায়
তো ঠিকই বসে বসে আঙ্গুল চোষতে
থাকিস। বুকের পাটা থাকলে বলে
দেখা-

আজ থেকে ফেলানির জন্য,
ভারতীয় চ্যানেল আর পণ্য-
বয়কট! বয়কট!! বয়কট!!!
নইলে চোতনার ব্যাপারী,
দেশপ্রেম রেডিওর ব্যাটারি-
চুপ থাক! চুপ থাক!! চুপ থাক!!!

মোরাল :
পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর জন্য যে
মেরুদণ্ডটি আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন
তা হচ্ছে ইসলাম। একমাত্র ইসলামের
মাধ্যমেই আপনি পারবেন নিজের কাছে
এবং অন্যের কাছে মাথা উঁচু করে
দাঁড়াতে। অন্যথায় আপনাকে
আপাতদৃষ্টিতে স্যুটেড-বুটেড

তারকাখচিত ইউনিফর্মড মনে হলেও আপনি ঠিকই জানেন আপনি একটি মেরুদণ্ডহীন তেলাপোকা ছাড়া আর কিছুই না। একদিকে প্রভুদের অন্যায় আদেশ 'জো হুকুম' বলে পালন করতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে সার্বক্ষণিক অন্তর্দহনে ছাঁরখার হতে হচ্ছে। এরপরও আপনি না পাচ্ছেন নিজের চোখে সম্মান, আর না পাচ্ছেন প্রভুদের কাছে ইজ্জত। তার উপর হঠাৎ করেই ধারালো ছুরি নিয়ে ঐশীরা এসে হাজির হচ্ছে মাঝরাতে। তখন আপনার আর কিছুই করার থাকছে না।

জাতীয়তাবাদী চেতনার ঘোরে যারা আচ্ছন্ন, তারা হয়তো নিজেদের ভিত্তিহীন গোঁড়ামিগুলোকে কিছু সময়ের জন্য জাস্টিফাই করতে পারেন। কিন্তু ফেলানিরা যখন ঘুরেফিরে আপনার গালে চপেটাঘাত করে যায় তখন আপনাকে টকশোর জন্যে বারবার ফোন করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনারা তখন পালিয়ে লাস-ভেগাস বা দার্জিলিং-এ অবকাশ যাপন করেন। আত্মসম্মান কী জিনিস তা কখনো চেখেও দেখার সুযোগ আপনাদের হয় না।

ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের এবং আল্লাহওয়ালাদের জন্য। মোল্লা উমরকে দেখেই শিখুন না। সামান্য স্যাভেল পরা কিছু সৈন্য নিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে আছেন। অথচ পৃথিবীর সবগুলো পরাশক্তি এবং তাদের দোসররা মিলে দীর্ঘ এক দশকেও তাকে বিন্দুমাত্র ঝুঁকাতে পারেনি। এই শক্তি ঈমানের, এই শক্তি আত্মসম্মানের। এই শক্তি বিবেকের, এই শক্তি ব্যক্তিত্বের। আমার লেখা পড়ে যদি কিছুটাও লজ্জাবোধ জেগে উঠে তবে ভাল কথা। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে আপনাদের মিডিয়া, লাঠিয়াল বাহিনী অথবা কোর্ট-কাচারি যা কিছু আছে ব্যবহার করতে পারেন। আমার ইজ্জত এবং নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমি আপনাদের সামনে মাথা উঁচু করেই থাকব বি-ইয়নিল্লাহ।

আমার মুসলিম ভাইদের বলছি,

যে ব্যক্তির জান-মাল স্বয়ং আল্লাহ কিনে নিয়েছেন এবং সকল পরাধীনতা থেকে যাকে আল্লাহই মুক্তি দিয়েছেন তার আবার কীসের ভয়? কেনই বা সে কোনো কিছুর পরওয়া করবে? এ ছোট্ট বিষয়টাই যারা বুঝতে পারে না তারাই একমাত্র দুনিয়ার ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। অথচ ভয় কিন্তু কখনোই এদের পিছু ছাড়ে না। এরা এক একজন চলতি ফিরতি জম্মি যারা মৃতও নয় যে দাফন করা যাবে; আবার জীবিতও নয় যে এদের দ্বারা সমাজে কোন পরিবর্তন আসবে।

আপনারা যারা আজকে বিভিন্ন বাহানায় গর্তের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছেন; সেই দিনকে ভয় করুন যেদিন আপনাদের হাতের, যবানের এবং অন্তরের শক্তি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। সেদিন জবাব আপনার অন্তরকেই দিতে হবে। বাহানাবাজ যবানে কিন্তু সেদিন সিল-গালা মেরে দেয়া হবে। জেনে রাখুন, একমাত্র আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে তাকে এই দুনিয়ার কোনো ভয়, শঙ্কা, জীর্ণতা বা ক্লান্তি কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না। তার হৃদয়ে আল্লাহ এমন এক বাদশাহি দান করবেন যার খোঁজ দুনিয়াবাসী জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ তার গোলাম হতেও রাজি হয়ে যাবে। যদি তাকে কারাগারের ছোট কুঠুরিতেও

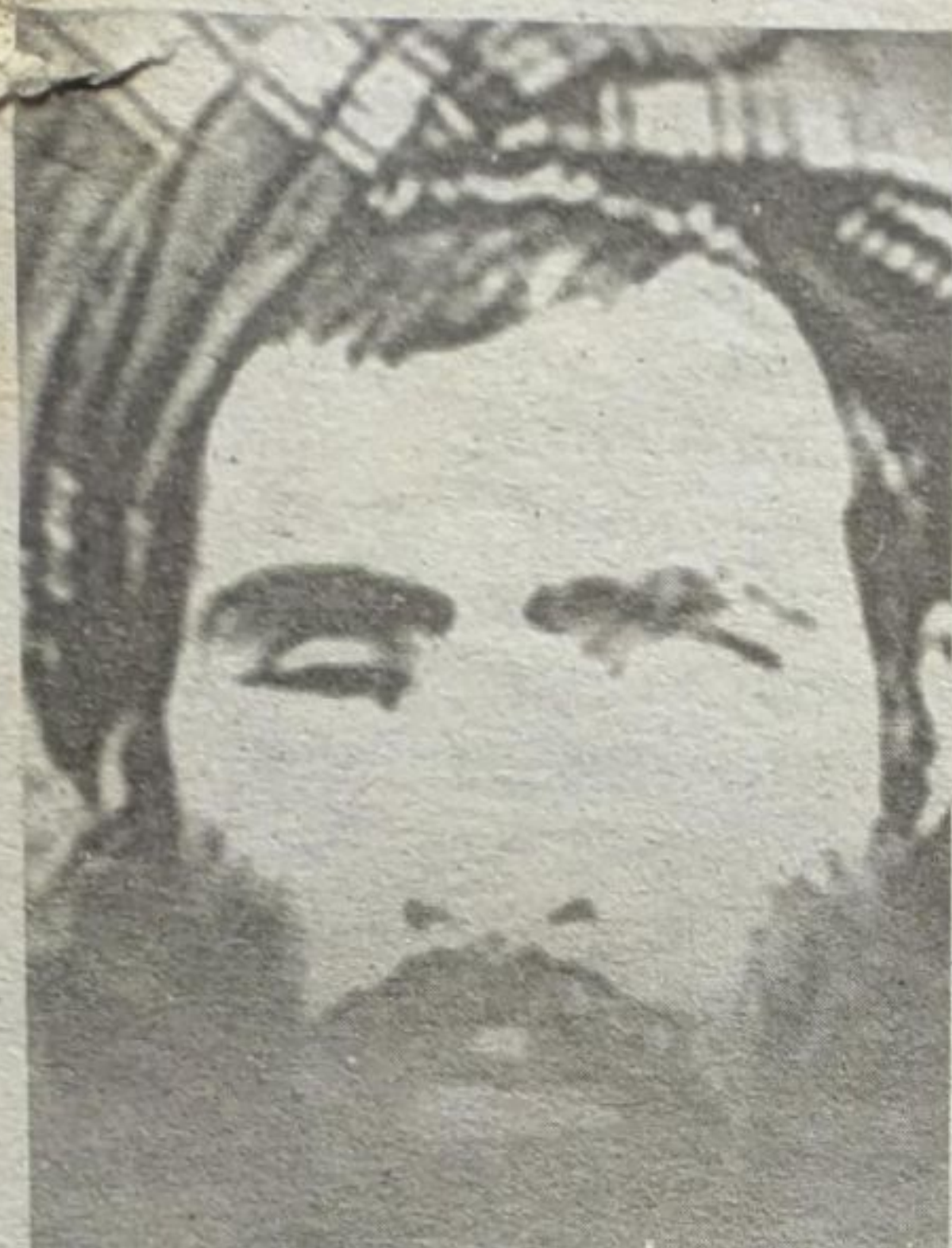
বন্দি করে রাখা হয়, তবুও তার হৃদয় থাকবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মতো মুক্ত-স্বাধীন। যতই তার হাতে পায়ে শিকল বাঁধা হোক; ডানা মেলে সে ঠিকই উড়ে বেড়াবে এমন এক আসমানে যার সম্পর্কে দুনিয়াপ্রেমিকদের কোনো ধারণা নেই। কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছেন, সাইয়িদিনা ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে মুক্তির আদেশ দেওয়ার পরও কেন তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন? কেনইবা তিনি বাদশাহর কাছে তার শর্ত পুরা না হওয়া পর্যন্ত কারাগার ত্যাগ না করার ফায়সালা জানালেন? ভাই, এটাই হচ্ছে সেই স্বাধীনতা যা তাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল রাজা-বাদশাহর ব্যাপারে বেপরওয়া করে দিয়েছে।

যে ব্যক্তির জান-মাল স্বয়ং আল্লাহ কিনে নিয়েছেন এবং সকল পরাধীনতা থেকে যাকে আল্লাহই মুক্তি দিয়েছেন তার আবার কীসের ভয়? কেনই বা সে কোনো কিছুর পরওয়া করবে? এ ছোট্ট বিষয়টাই যারা বুঝতে পারে না তারাই একমাত্র দুনিয়ার ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। অথচ ভয় কিন্তু কখনোই এদের পিছু ছাড়ে না। এরা এক একজন চলতি ফিরতি জম্মি যারা মৃতও নয় যে দাফন করা যাবে; আবার জীবিতও নয় যে এদের দ্বারা সমাজে কোন পরিবর্তন আসবে।

নিজের সামান্য জীবন নিয়ে খুব বেশি সংশয়ের কোনো কারণ নেই। নিরাপত্তা আল্লাহর তরফ থেকেই। আল্লাহ যদি নিরাপত্তা দান করেন তবে সারা বিশ্বের সমস্ত শক্তি মিলেও আমার একটি পশম উপড়াতে পারবে না ইনশা-আল্লাহ। আর যদি আল্লাহ চান যে, তার দুশমনদের বুলেট আমার সিনাকে ছেদ করে যাবে, তবে আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন আমি সেই বাহানাই খুঁজে বেড়াচ্ছি হন্যে হয়ে। ইয়া আল্লাহ, আপনার দুশমনের শৃঙ্খল থেকে বান্দা রেজাকে মুক্ত রাখুন, কিন্তু তাদের বুলেট থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমীন, ইয়া রব্বী।

ওয়াসসালাম
বান্দা রেজা

ফিলকদ- ১৪৩৪, সেপ্টেম্বর ২০১৩।



মোল্লা উমর জিহাদের সৌরভে সূর্য এক পুষ্প

গাজী মাযহারুল ইসলাম



জন্ম ও বংশ

নাম- মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ কান্দাহারি। পিতার নাম মৌলবি গোলাম নবী আখন্দ। দাদার নাম মোল্লা মুহাম্মাদ রাসূল এবং প্রপিতামহের নাম মৌলবি মুহাম্মাদ আয়ায আখন্দ। ১৯৬০ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের খাকরেজ জেলার জাহ হিমত গ্রামের এক দীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মোল্লা উমরের পিতা গোলাম নবীও অত্র এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই এলাকায়ই বিভিন্ন হালাকায় দীনি শিক্ষা অর্জন করেন। দীনি শিক্ষাদান, ওয়ায-নসিহতের কারণে লোকদের কাছে একজন আলেম ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মোল্লা উমরের জন্মের দু' বছর তাঁর পিতা কান্দাহার প্রদেশের খাকরেজ জেলা ত্যাগ করে যায়। প্রদেশের বেরু নামক জেলায় স্থানান্তরিত হন। সেখানেই দীনি খেদমতে নিয়োজিত থাকাবস্থায় ১৯৬৫ সালে মোল্লা উমর পাঁচ বছরের শিশু থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। ছোট এক ভাই ও বড় তিন বোন মারা গিয়েছিল শৈশবেই। মোল্লা উমর শুধুমাত্র এতিমই ছিলেন না, বরং পিতা হারানোর সাথে সাথে তার বুকে জমা ছিল ভাই-বোনদের হারানোর সীমাহীন যন্ত্রণা। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে, এই এতিম-মিসকিন ছেলেটিই হবে চলমান শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ ও পরাশক্তির আরামের ঘুম হারামকারী আমীরুল মুমিনীন।

পিতার মৃত্যুর পর মোল্লা উমরকে পরিবারের সাথে বেরু জেলা থেকে উরুজগান জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে চাচা মৌলবি মুহাম্মাদ আনোয়ার ও মৌলবি মুহাম্মাদের

তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করেন।

শিক্ষা-জীবন

আট বছর বয়সে মোল্লা উমর উরুজগান জেলার একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন তাঁর চাচা মৌলবি মুহাম্মাদ। চাচার তত্ত্বাবধানেই ওই মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর আঠার বছর বয়সে আফগানিস্তানের প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা অর্জন শুরু করেন। এমতাবস্থায় কম্যুনিষ্টরা আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করে। তাই তাঁর উচ্চ শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়।

বংশ ও গোত্রীয় দিক দিয়ে মোল্লা উমর পাখতুনের হুতক শাখা তুমযাই থেকে ছিলেন। ১৮৮০ সালে ইরানি সফবি যালিমদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা দীনদার, বিচক্ষণ সর্বজন গ্রহণযোগ্য মুজাহিদ বিজয়ী বীর মীর ওয়েস (রহ:) এই গোত্রেরই ছিলেন।

মোল্লা উমরের পরিবার সর্বদা ইলম, দীনদারি ও মুআল্লিমীন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। দীনদারি এবং সামাজিকতার দরুণ সাধারণ জনগণের কাছে এ পরিবার গ্রহণযোগ্য ছিল অনুকরণীয় এক আদর্শ।

জিহাদি-জীবন

মোল্লা উমর তখনও বয়সের দিক দিয়ে তৃতীয় দশকে পা রাখেননি। ইসলামের উর্বর ভূমি আফগানিস্তানে নাস্তিক-কম্যুনিষ্টরা আধিপত্য বিস্তার করল। তখন তিনি শিক্ষার্জন অসমাপ্ত রেখেই উরুজগানে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির অধীনে জিহাদ শুরু করেন। অল্প দিনে বীরত্ব ও সাহসিকতায় সবার বিশ্বাস অর্জন করেন। যখন দেওহরাউদ জেলায় বিভিন্ন এলাকার মুজাহিদরা বিশাল লক্ষ্য নিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে

আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলেন, তখন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত মুজাহিদরা মোল্লা উমরকে গ্রুপ প্রধান নির্বাচন করেন। তিনি এই অপারেশনও অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। এই যুদ্ধেই তিনি প্রথমবারের মতো আহত হন। তিনি ধারাবাহিক তিন বছর নিজের এলাকার মুজাহিদদের সাথে রুশ ও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর তিনি ১৯৮৩ সালে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির প্রসিদ্ধ কমান্ডার শায়খ ফয়যুল্লাহর অধীনে কান্দাহার জেলার মেওয়ান্দে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। দিনে দিনে তার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। অবশেষে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির প্রধান মৌলবি মুহাম্মাদ নবী মুহাম্মাদীর নেতৃত্বে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির পক্ষ থেকে একটি পৃথক স্বতন্ত্র গ্রুপের কমান্ডার নির্বাচিত হন।

এরপর মোল্লা উমর ১৯৮৩-১৯৯১ সাল পর্যন্ত কান্দাহারের যাড়ি, মেওয়ান্দ, ইয়ানজুয়ায়ি এবং ডাঁভে সোভিয়েতের শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহে হামলা শুরু করেন। প্রায় প্রতিদিন হামলা পরিচালনা করতেন। এমনভাবে জাবুল প্রদেশের সাফা ও মারকায কিলাত জেলার কাবুল-কান্দাহারের প্রধান সড়কে উল্লেখযোগ্য অপারেশন পরিচালনা করেন। মোল্লা উমরের প্রিয় অস্ত্র ছিল আর.পি.জি-৭ (এন্টি ট্যাঙ্ক-রকেট)। যা তিনি রাশিয়ান ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। রকেট লাঞ্চার চালানোর ক্ষেত্রে খুবই দক্ষতা ছিল তাঁর। রাশিয়ানদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে কান্দাহারের এসব অপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সড়কে এত পরিমাণে কম্যুনিষ্টদের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় যে, হেরাতের রাস্তার দু'পাশে ট্যাঙ্ক ও শত্রুদের গাড়ির দেওয়াল নির্মাণ হয়ে যায়। রাশিয়াবিরোধী জিহাদে মোল্লা উমর চারবার আহত হন, এমনকি শেষের বার তাঁর ডান চক্ষু হারিয়ে ফেলেন।

১৯৯২ সালে ডক্টর নজিবের পতনের পর জিহাদিগ্রুপের দাঙ্গার প্রারম্ভে মোল্লা উমর তার কিছু বিশ্বস্ত সাথীদের সাথে

নিজ অস্ত্র রেখে নিজের জিহাদি অঞ্চল কান্দাহার প্রদেশের মেওয়ান্দ জেলার সঙ্গ হেসারের একটি গ্রামে হাজী ইব্রাহীম মসজিদের পাশে একটি মারকায প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মারকাযেই থাকা শুরু করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর জিহাদের পর নিজের কিছু সাথীদের সাথে অসম্পূর্ণ ইলম অর্জনে ব্রতী হন।

বিশৃংখলা, অশান্তি ও গৃহযুদ্ধ পরবর্তী ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা

সারাদেশে যখন অশান্তি বিরাজ করছিল, একের পর এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। মোল্লা উমর তখন আপন মুজাহিদ সাথীদের সাথে কান্দাহারের মেওয়ান্দ জেলায় ছিলেন। সারাদেশের অনিশ্চিত অবস্থা তাকে ভাবিয়ে তুলল। সব খবরাখবর নিয়মিত রাখছেন।

এই অরাজকতার অবসানকল্পে মোল্লা উমর ও সাথীরা মিলে প্রসিদ্ধ উলামা-মাশায়েখদেরকে নিয়ে কান্দাহারের ইয়ানজুয়ানি জেলার যাদ্গাওয়াত এলাকায় একটি বৈঠকের

কান্দাহার থেকে শুরু হওয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সারা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। যখন ইমারাতে মুজাহিদরা একসময় অর্ধেকেরও বেশি আফগানিস্তান দখল করে নেন তখন ১৪১৬ হিজরি ১৫ যিলকদে কান্দাহারের ১৫০০ উলামায়ে কেরামের একটি বৈঠক সম্পন্ন হয়। সেই বৈঠকেই আলেমগণ ইমারাতে প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে মোল্লা উমরকে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করেন। এভাবে ১৯২৪ সালে খিলাফাতে উসমানিয়া পতনের ৭২ বছর পর ১৯৯৬ সালে একটি শরীয়াহ পরিচালিত ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। এর কিছুদিন পর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল মুজাহিদদের হস্তগত হয়। এভাবেই আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ ভূমি মুজাহিদদের পদচুম্বন করে। মোল্লা উমরকে যখন বিশিষ্ট উলামাদের উপস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করা হলো তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাননি। বরং তিনি বলেছিলেন, হে উলামায়ে কেরাম! আজ আপনারা

মোল্লা উমরের প্রিয় অস্ত্র ছিল আর.পি.জি-৭ (এন্টি ট্যাঙ্ক-রকেট)। যা তিনি রাশিয়ান ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। রকেট লাঞ্চার চালানোর ক্ষেত্রে খুবই দক্ষতা ছিল তাঁর। রাশিয়ানদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে কান্দাহারের এসব অপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সড়কে এত পরিমাণে কম্যুনিষ্টদের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় যে, হেরাতের রাস্তার দু'পাশে ট্যাঙ্ক ও শত্রুদের গাড়ির দেওয়াল নির্মাণ হয়ে যায়। রাশিয়াবিরোধী জিহাদে মোল্লা উমর চারবার আহত হন, এমনকি শেষের বার তাঁর ডান চক্ষু হারিয়ে ফেলেন।

আয়োজন করেন। রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের যুগে মুজাহিদদের প্রধান বিচারপতি মৌলবি সায়্যিদ মুহাম্মাদ (যিনি মৌলবি ইয়াসিনি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন) মোল্লা উমরকে বলেন, তুমি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। এই বৈঠকেই মোল্লা উমর ইসলামি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৫ মুহাররম ১৪১৫ হিজরিতে যুলুম ও ফাসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করেন।

শরঈ ইলমের ভিত্তিতে নবীগণের উত্তরাধিকার হিসেবে যে দায়িত্ব আজ আমার কাঁধে অর্পণ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এর দৃঢ়তা অথবা স্থলনের পূর্ণ জিম্মাদার আপনারা সবাই। আমাদের উস্তাদবৃন্দ এবং সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! আল্লাহ না করুন, যদি আমাদের থেকে মুসলমানদের এই আমানতের মধ্যে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে এর সংশোধন এবং ইসলাহ করা আপনারা

নিজেদের শরঈ ইলমের আলোতেই তালেবান মুজাহিদদের অবিচলতা এবং তাদের সত্য রাস্তার উপর চলার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিবেন। যদি তালেবানের পক্ষ থেকে ইসলামি আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি হয়ে যায়, আর আপনারা তা দেখেন, অথচ ইসলামের জন্যে কিছু না বলেন, তাহলে আল্লাহর কাছে এর দায়িত্ব আপনাদের উপর এবং আমি প্রশ্ন-উত্তরের দিন আপনাদের গর্দান আকড়ে ধরব।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মোল্লা উমরের ব্যক্তিত্বঃ

উম্মাহর নেতৃত্বের পূর্ণ যোগ্যতা আরশের অধিপতি দান করেছিলেন মোল্লা উমরকে। অত্যন্ত সাধাসিধে জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের মতো বিলাসী ছিলেন না। অনর্থক কথা বলতেন না, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তার কথা হতো প্রাজ্ঞ, পূর্ণ দৃঢ় ও যৌক্তিক। উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলার পূর্বে আমেরিকা মুজাহিদদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানো শুরু করে। কিন্তু মোল্লা উমর এই তামাম শয়তানি মিডিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তা, প্রশান্তি, পূর্ণ নির্ভরতা ও প্রত্যয়ের সাথে সহজ সরল ভাষায় অর্থপূর্ণ কয়েকটি বাক্য দ্বারা নিজের গোত্রকে সান্তনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলার জন্যে আমেরিকা এবং পিপিলিকা বরাবর। আমেরিকা এবং তাদের জোটবাহিনীকে এটা জেনে রাখা উচিত যে, ইমারাতে ইসলামিয়া এমন কোনো শাসন ব্যবস্থা নয় যে, এর আমীর জহির শাহ (আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ) এর মতো ক্রমে চলে যাবে এবং সৈন্যরা তোমাদের সম্মুখে অস্ত্র ফেলে দেবে। বরং এটা হচ্ছে জিহাদের উপর সুশৃঙ্খল একটি ঘাঁটি।

যদি তোমরা শহরসমূহ এবং রাজধানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে নাও, ইসলামি হকুমতকে পতনও করে

মাল্লা উমর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মানহাজের অনুসারী ছিলেন। সুন্নাতে নববির অনুসরণে যেন ছিলেন ঠিক প্রথম উমর। শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের কট্টরবিরোধী ছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবি এবং সাংগঠনিক বাড়াবাড়ি তার মোটেও পছন্দের ছিল না। সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মগত ঐক্যের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন তিনি।

নিজেও ছিলেন এর জ্বলন্ত প্রতীক।

ফেলো, তাহলে আমাদের মুজাহিদরা গ্রাম এবং পাহাড়ে চলে যাবে। তখন তোমরা কী করবে? অতঃপর তোমরা কম্যুনিষ্টদের মতো রাস্তা-ঘাটে পড়ে মরবে। তোমরা জেনে রাখো যে, বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধ সৃষ্টি করা সহজ, কিন্তু বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধের সমাপ্তি করা অনেক কঠিন। মৃত্যু অপ্রতিরুদ্ধ সত্য। আর তা সবাইকে গ্রাস করবেই। আমেরিকার সাহায্য করে বেঈমানি এবং লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যু আসা ভাল, নাকি ইসলামের অবস্থায় ঈমানের সাথে সম্মানিত অবস্থায় মৃত্যু আসা উত্তম? ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বাস্তবতা এখন আপনার সামনে।

এমনিভাবে তিনি আমেরিকান হামলার শুরুতে একটি রেডিও বার্তায় বলেছিলেন, অস্ত্র মৃত্যু দিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না।

বেশি বলার চেয়ে বেশি কাজ প্রিয় ছিল তাঁর। জীবন ছিল লৌকিকতা থেকে পবিত্র। তার এই সাধাসিধে জীবন সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। সাধারণ পোষাক, সাধারণ খাদ্য, লৌকিকতামুক্ত কথা, সাধারণ উঠাবসা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। লৌকিকতাপূর্ণ চালচলন তাঁর মোটেও পছন্দ ছিল না।

আলেম-উলামাদের খুবই সম্মান করতেন তিনি। এসব কারণেই তার অধীনস্থ মুজাহিদরা তাঁকে খুবই ভালবাসেন।

মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে গুরুত্বারূপ

মুসলমানদের একজন নেতা হিসেবে

সমগ্র মুসলিমবিশ্বের খবরাখবর বিশেষভাবে রাখতেন তিনি। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে বিশ্বের সমগ্র মুসলিমদেশের শাসকদের অবস্থানের বিরোধিতা করেন। তিনি দখলদার জায়নবাদীদের হাত থেকে মসজিদে আকসাকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানদের শরঈ দায়িত্ব মনে করতেন। মোল্লা উমর ছিলেন একজন দরদী নেতা। মুসলমান ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা এগুলো তার দাবি নয়, বরং সর্বদা তাদেরকে তাঁর অবস্থান কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

আকীদা ও মতাদর্শ

মোল্লা উমর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মানহাজের অনুসারী ছিলেন। সুন্নাতে নববির অনুসরণে যেন ছিলেন ঠিক প্রথম উমর। শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের কট্টরবিরোধী ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবি এবং সাংগঠনিক বাড়াবাড়ি তার মোটেও পছন্দের ছিল না। সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মগত ঐক্যের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন তিনি। নিজেও ছিলেন এর জ্বলন্ত প্রতীক। কুরআন-সুন্নার আলোকে সালফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাসলাকে পথ চলাকে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করতেন তিনি।

জাগো বিপ্লবী রিদ্বাহী প্রাণ

জাগো চির রণবীর,

তোমরাই হবে সিপাহসালার

নতুন শতাব্দীর।

জাগো হে নবীন করো মোর সাথে

দীপ্ত অঙ্গীকার,

তোমাদেরকেই নিতে হবে পুনঃ নয়া

যামানার মহাভার।

যামানার সাথে বদলায় যারা

তাহারা বড় অসহায়,

তাহারাই মহা-মানব যাহারা

যামানারে বদলায়।

শেষ যামানায় প্রথম যুগের

অবাক করা সেই দৃশ্য,

একদিকে এক মর্দে মুমিন

আরেকদিকে সারা বিশ্ব।

ইতিহাস ৯/১১ এ শুরু হয়নি

মু'তাসিম বিল্লাহ আল-মামুন



এক.

রাতের আঁধারে চুপচাপ শুয়ে আছে মেয়েটি। বিছানার একপাশে দলা পাকিয়ে বালিশে মুখ গুজে নিঃশব্দে কাঁদছে। শব্দ করার শক্তিও আর নেই। এই ছোট্ট জীবনে অনেককিছু দেখে ফেলেছে। পৃথিবীটাকে খুব নোংরা মনে হয়। এখানে এত পশুর বসবাস!

যেদিন থেকে ওর শরীরের ওপর আমেরিকান সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেদিন থেকেই সব কেমন যেন হয়ে গেছে। এখন সব স্বপ্ন আবছা লাগে। মুখ ভরা তেতো বিস্বাদ, জীবনটা কী কষ্টের! বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা মধুর গল্পখানা কবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। একজন পুরুষের উষ্ণ বুকে মাথা রেখে সব কষ্টটুকু উজাড় করে দিতে কখনো কি আর পারবে? সীমার শরীরটা কেঁপে উঠে। আতঙ্কে ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে কিনা অন্ধকারে সেটা আর বোঝা যায় না।

দুই.

সাকিব তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে। কতদিন এই মাঠে এসে খেলেছে ওরা! একদল ছেলে মিলে একটা বলের পিছে ছুটোছুটি। গোল! গোল! শোরগোল। প্রান্তের সাথে প্রথম এখানেই তো দেখা হয়, তাই না? এরপর দুজনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। অথচ দু'জনই সবসময় আলাদা টীমে খেলতো। কারণ ওদেরকে এক দলে ফেলা মানে খেলার ফলাফল জেনে যাওয়া। কত রাত এই মাঠে এসে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিয়েছে। দুঃখের

সময় বন্ধুর ঠাট্টা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে জীবনের সব হতাশা। আহ! বুকের মধ্যে চাপা কী একটা বিঁধছে? এটাই কি বেদনা? মার্কিনদের ড্রোন অ্যাটাকে প্রান্ত মারা যাওয়ার পর এখন সাকিব একা। স্মৃতিগুলো চোখের পানিতে আবছা হয়ে আসে।

তিন.

মুমিনার বিয়ে হয়েছে চার বছর। স্বামীর আদরে দুনিয়া ভুলে থাকে, ভুলতে পারে না একটা সন্তানের কথা। চার বছরেও স্বামীকে একটা সন্তান দিতে পারেনি ও। বিশাল সময়। মা ডাক শোনার হাহাকারে বুকেটা খাঁ খাঁ করে। বহু প্রতীক্ষার পর ও মা হতে চলেছে! কী আনন্দের সেই দিন! নয়টা মাস ভারী শরীরটাকে যত্ন করে আগলে রাখে মুমিনা আর ওর স্বামী হাসিব। প্রথম সন্তান! আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক অপূর্ব নিয়ামত। ফুটফুটে মেয়েটা জন্মের রাতেই একবুক মায়া জড়িয়ে বাচ্চার নাম রাখে আশা। কত আশা মুমিনার আশাকে নিয়ে! মেয়ে বড় হবে, পড়াশুনা করবে, বিয়ে হবে। কিন্তু কোথায় আশা? নরপশুদের গুলিতে ওর ছোট্ট বুকেটা যে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আশার মরদেহ দেখে চেনা যায়নি। লাল একটা মাংসপিণ্ড কবরে নামিয়ে রেখেছে সবাই। ওটা কি আশা? আশার সেই মিষ্টি হাসিটা কোথায় মিইয়ে গেছে? কিছুই বোঝেনা মুমিনা। মা! মা! মা! উদভ্রান্ত মায়ের অন্তরে এই একটা কথাই বাজতে থাকে। মা ডাকটা শোনার আগেই কে যেন তার অন্তরটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

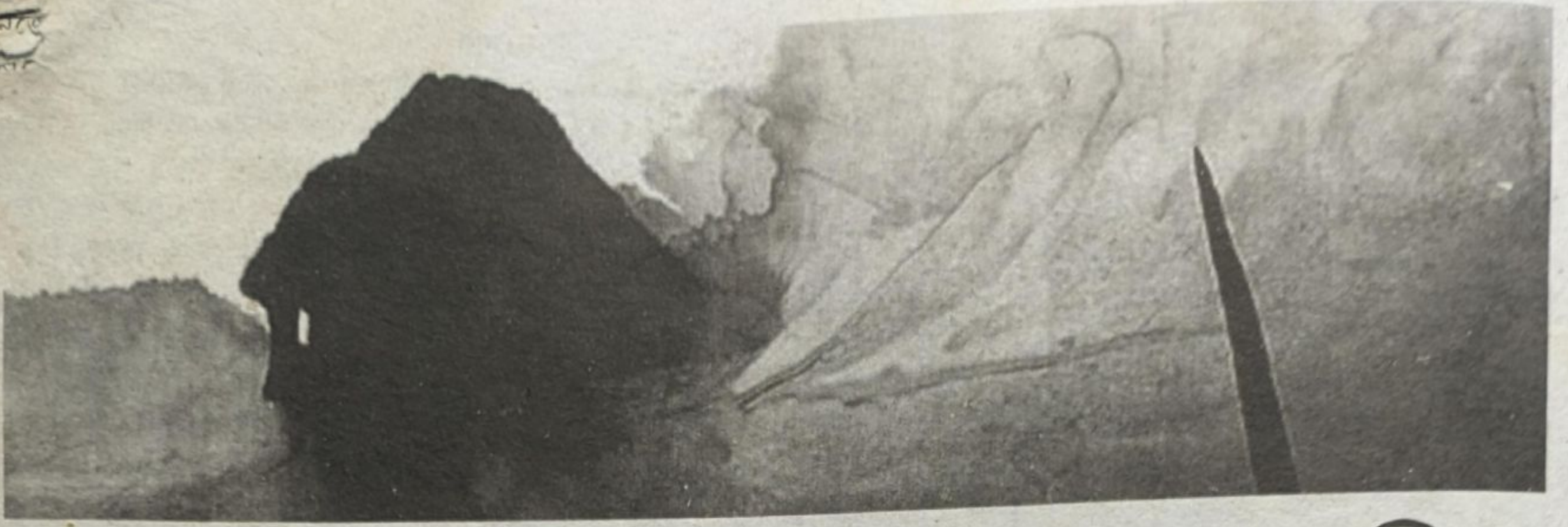
চার.

না...! মীরুর চিৎকারে আজো সবুজের ঘুমটা ভেঙে যায়। সবুজ তাকিয়ে থাকে। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। মীরু তো এমন ছিল না! কত হাসিখুশি একটা মেয়ে ছিল। বিনা কারণে হেসে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কথায় কথায় সবুজের সাথে খুনসুটি করেছে। ছোট্ট ঝগড়ায় সারারাত কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। ইমোশনাল ছিল বলে সবুজের হালকা বকাও খেয়েছে। সেই মেয়ে আজ এত অনুভূতিহীন? কথা বলে না, হাসে না, কাঁদে না, শুধু রাতের আঁধারে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠে। মীরুকে চোখের সামনে এমন জীবন্ত লাশ বনে যাওয়া দেখে সবুজ। সবুজের চোখ জ্বলে, কিন্তু কাঁদতে পারে না। ও যে পুরুষ। বুক ফেঁটে চাপা আতর্জনাদ বেরিয়ে আসতে চায়। নিজের স্ত্রীকে চোখের সামনে ধর্ষিত হতে দেখেছে ও। হাত-পা বাঁধা থাকায় কিছুই করতে পারেনি। অসভ্যদের কারাগার থেকে মীরুকে নিয়ে কীভাবে পালিয়ে এসেছে সেসব আর মনে করতে চায় না সবুজ। ওদেরকেই লোকে বলে সভ্য-সমাজ। যত্নসব বাজে কথা!

পাঁচ.

দশ-বারোজন যুবক। এদের কারো বাড়িতে বাবা-মা আছে, কারো আছে স্ত্রী-সন্তান। ঘর পেছনে ফেলে তারা বহুদূর উঠে এসেছে। নির্জন পাহাড়ের ওপর। আমেরিকার সৈন্যদের অপেক্ষায় ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। অন্ধকারেও ওদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে। আল্লাহর সাথে জান্নাতে করা প্রতিজ্ঞার কথা ওরা ভুলে যায়নি। সাদামাটা পোষাক, কিন্তু এক একজনকে দেখতে লাগে অসাধারণ। অন্তরের ঈমান চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসে। ওদের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন। কলুষতাহীন পবিত্র এক পৃথিবীর স্বপ্ন। ওরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। শহীদি তামান্না নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, হাসতে হাসতে মরণকূপে ঝাঁপ দেয়ার আকাঙ্ক্ষা। শত্রুরা ওদের ভয়ে অস্থির। ধাতব ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেঙে সেই ভয়ের গোঙানি শোনা যায়। পরাজয় কী এই ছেলেগুলো জানে না। ওরা জানে সন্তানহীন মায়ের প্রলাপ, ওরা জানে নিষ্পাপ বোনের ইজ্জত হারানোর কষ্ট, ওরা

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়



আপনার ধান্দা কী?

ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল

এখনকার দিনে তরুণদের একমাত্র ধান্দা হচ্ছে যত বেশি পারা যায় ফুটি করা, আনন্দে থাকা, জীবনের স্বাদ উপভোগ করা। সবার মধ্যে একই চিন্তা কিভাবে একটা অ্যাফেয়ার করা যায়। একটা বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড খুবই প্রয়োজন— তা না হলে জীবনটাই বৃথা! এরকম একটা মানসিকতা সবার মধ্যে। হলিউড-বলিউড সংস্কৃতির তীব্র আত্মাসন তাদের চিন্তার জগতকে এতটাই দখল করে নিয়েছে যে, এসব ছাড়া অন্য কোন কিছু তারা ভাবতেই পারে না। বিয়ের আগে প্রেম, সেক্স এগুলো এখনকার দিনের ফ্যাশন।

আজকাল আমাদের সমাজে এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে কোন না কোন ধান্দার পেছনে ছুটছে না। উঠতি বয়সের তরুণ থেকে শুরু করে বয়সী কর্মজীবী মানুষ, সবাই একটার পর একটা ধান্দায় সমস্ত জীবন পার করে দিচ্ছে। নিজের ধান্দা ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় কারো নেই। সবার মুখে একই কথা— ভাই আমি খুবই ব্যস্ত, আমার কোন সময় নেই।

আসুন আমরা দেখি কোন ধান্দার পেছনে আমরা পাগলের মত ছুটে চলেছি আর কী নিয়েই বা সমাজের তরুণ বৃদ্ধ সবাই এত ব্যস্ত।

এখনকার দিনে তরুণদের একমাত্র ধান্দা হচ্ছে যত বেশি পারা যায় ফুটি করা, আনন্দে থাকা, জীবনের স্বাদ উপভোগ করা। সবার মধ্যে একই চিন্তা কিভাবে একটা অ্যাফেয়ার করা যায়। একটা বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড খুবই প্রয়োজন— তা না হলে জীবনটাই বৃথা! এরকম একটা মানসিকতা সবার মধ্যে। হলিউড-বলিউড সংস্কৃতির তীব্র আত্মাসন তাদের চিন্তার জগতকে এতটাই দখল করে নিয়েছে যে, এসব ছাড়া অন্য কোন কিছু তারা ভাবতেই পারে না। বিয়ের আগে প্রেম, সেক্স এগুলো এখনকার দিনের ফ্যাশন। লেকের পাড়ে, পার্কে, লাইব্রেরির

বারান্দায় সর্বত্র যুগলদের সদাসর্বদা ব্যাপক উপস্থিতি এখন আর কারোরই চোখ এড়ায় না। আজকাল ছেলে-মেয়ে সম্পর্ক শুধু নির্দোষ প্রেম কিংবা বিয়ের সম্পর্ক নয়— এসব ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছুই ঘটে, যা এখন ওপেন সিক্রেট। ছেলেরা একটা মেয়ে খুঁজছে সর্বত্র, সর্বক্ষণ। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি ছবি, মিউজিক ভিডিও, সিনে ম্যাগাজিন কিংবা সাইবার ক্যাফেতে ডাউনলোড করা পর্নোছবি সব কিছুতেই ছেলেদের একটাই ধান্দা— একটা মেয়ে।

ছেলেদের এই ধান্দা পূরণের জন্য সমস্ত নগর জুড়ে চলছে আরো নানা আয়োজন— কনসার্ট, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

বারে গিয়ে দামী বিদেশি মদ, বিয়ার ইত্যাদি সম্ভব না হলেও অন্ততপক্ষে ডাইল কিংবা ইয়াবার ফিলিংস নেয়া বর্তমান প্রজন্মের অনেক তরুণের কাছে আরেকটা ধান্দা। আর এই ধান্দার পেছনে ছুটতে গিয়ে তারা চুরি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে।

বয়সের সাথে সাথে আমাদের ধান্দাও পাল্টায়। শিক্ষাজীবনের শেষে যুবকদের মাথায় ঢুকে ক্যারিয়ারের ধান্দা। এখন তার মাথায় একটাই চিন্তা— কিভাবে, কাকে ধরে, ঘুষ কিংবা তোষামোদ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া যায়। সহসাই সে বুঝতে পারে চাকরির বাজারে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনেক, তাই তাকে জ্যাক ধরতে হবে। শুরু হয় মামা খোঁজার ধান্দা। একটা ভাল চাকরির জন্য সে সবকিছু করতে রাজি। এমনকি নিজেকে বিক্রি করতেও তার মনে কোন বাধা নেই।

এবার চাকরি পাবার পর তার চিন্তা এর চেয়ে ভাল চাকরি কিভাবে পাওয়া যায় অথবা কিভাবে বসকে খুশি করে তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাওয়া যায়। আর বসকে খুশি করার উপায় হচ্ছে, নয়টা থেকে নয়টা গাধার মত খাটা আর বসের সব ইচ্ছা পূরণ করা। বস তার কাছে দেবতার মতো, বসকে কিছুতেই অসন্তুষ্ট করা যাবে না। সারাক্ষণ বসের প্রশংসা করতে হবে। বস ইজ অলওয়েজ রাইট। বসের সামান্য অনুরোধই তার জন্য হুকুম। স্যারের প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রত্যেক অফিসে যেন প্রতিযোগিতা চলছে। সবার মাথায় একটাই ধান্দা কিভাবে আরো উপরে উঠা যায়। দুনিয়ার অন্য কোন কিছু নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? এই চাকরিটাই যেন তার জীবন। তার ধারণা এই চাকরিই তার জীবনের সফলতা ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে যদি তার চাকরিটা মোটামুটি স্থায়ী হয়ে যায় আর এর মধ্যে দু'একটা প্রমোশনও জুটে যায় তাহলে সে যথেষ্ট আস্থার সাথে বিয়ের বাজারে দরদাম শুরু করতে পারে।

অপরদিকে যারা চাকরির ধান্দায় অন্যদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তাদের ধান্দা হচ্ছে যে কোনভাবে হোক দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানো। বিদেশে যাবার ধান্দা মাথায় ঢুকলে শুরু হয় বিভিন্ন বিদেশি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সপ্রেশন যাওয়া। আর সেই সাথে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন নামী-বেনামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটার পর একটা এপ্লিকেশন পাঠানো। এর মধ্যে চলতে থাকে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স কিংবা SAT/ TOEFL/ ILETS এ ভাল স্কোর করার প্রাণপণ চেষ্টা। দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ধান্দার পেছনে খরচ হতে থাকে লাখ

আমাদের জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের ধান্দাগুলো পূরণের কাজে। যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরিব সবাই এমন একটা কালচারের দাস হয়ে পড়েছি যা আমাদেরকে ব্যস্ত রাখছে বস্তুগত এবং ইন্দ্রিয় সুখ লাভের সার্বক্ষণিক চেষ্টার মধ্যে। আমাদের মধ্যে যে যত বেশি সম্পদ উপার্জন এবং ফুটি করতে পেরেছে তাকে তত বেশি সফল বলে মনে করা হচ্ছে।

লাখ টাকা। অনেক সময় সে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠে যে, অবৈধ পথে বিদেশে যাবার মত বিপজ্জনক পথ বেছে নিতেও সে পিছপা হয় না। বয়স যখন পঁয়ত্রিশের কোঠা পেরোয় আর সংসার জীবন শুরু হয় তখন তার ধান্দাও পাল্টে যায়। এখন তার আসল ধান্দা কিভাবে ধন-সম্পদ আরো বাড়ানো যায়। এজন্য বৈধ-অবৈধ যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে সে রাজি।

সে চিন্তা করতে থাকে তার যখন ৬৫ বছর বয়স হবে তখন সে কতটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তার সন্তানদের জন্য কত বেশি সম্পদ রেখে যেতে পারবে। এখন এটাই তার একমাত্র মাথাব্যথা। সে দিনরাত পরিশ্রম করে যাতে করে আরো বেশি টাকা উপার্জন করা যায় এবং ভবিষ্যতের সকল ঝুঁকি ও বিপদাপদ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করা যায়। নামী কোম্পানির শেয়ার কেনা, ব্যাংকে উচ্চ হারে সুদী ডিপোজিট একাউন্ট খোলা, জমি কেনা, ব্যাংকলোন নিয়ে এপার্টমেন্ট কেনা, বিভিন্ন ব্যবসায় টাকা খাটানো ইত্যাদি সব উপায়েই সে চেষ্টা করতে থাকে যাতে করে আরো বেশি সম্পদশালী হতে পারে। এর কোন শেষ নেই। তার আরো চাই, আরো। একটা ধান্দা পূরণ হলে তাকে আরেকটা ধান্দার নেশায় পেয়ে বসে।

টাকাই হচ্ছে চূড়ান্ত ধান্দা। যেন এটা একটা ড্রাগ, যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। তার সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য— টাকা উপার্জন। একটাই মাপকাঠি— আর্থিক লাভক্ষতি। লাভ হলে কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করে বা কথা বলে আর লাভের সম্ভাবনা না থাকলে করে না।

অপরদিকে নিজের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজেকে সফল প্রমাণ করার ক্রমাগত চাপ তো আছেই। যত টাকা আর সম্পদ তত সম্মান, গুরুত্ব, স্ট্যাটাস, আর নিরাপত্তা। এটাই আজকের সমাজের প্রচলিত ধারণা।

এবার থামুন এবং চিন্তা করুন— আমাদের জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের ধান্দাগুলো পূরণের কাজে। যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরিব সবাই এমন একটা কালচারের দাস হয়ে পড়েছি যা আমাদেরকে ব্যস্ত রাখছে বস্তুগত এবং ইন্দ্রিয় সুখ লাভের সার্বক্ষণিক চেষ্টার মধ্যে। আমাদের মধ্যে যে যত বেশি সম্পদ উপার্জন এবং ফুটি করতে পেরেছে তাকে তত বেশি সফল বলে মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা এই ধান্দা কালচারের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে আছি তারা কিন্তু খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করে এটা গ্রহণ করিনি। জীবনের সফলতার এই ধারণাকে আমরা অন্ধভাবে গ্রহণ করেছি। কখনও প্রশ্ন করিনি এই ধারণাটা ঠিক না ভুল? বরং আমরা সমাজে আগে থেকেই যে সব ধান্দা প্রচলিত আছে সেগুলোকে অন্ধভাবে অনুকরণ করছি মাত্র। সমাজে বহমান মিথ্যার চোরাস্রোতে ভেড়ার পালের মতো গা ভাসিয়ে চলছি। সব সময় সমাজের বাকি লোকদের সাথে নিজেকে তুলনা করি এবং তাদের সাথে ধন-সম্পদ উপার্জন আর ভোগ বিলাসের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই। কিন্তু কখনও জানতেও চেষ্টা করি না আমাদের সমাজের লোকদের এই চিন্তা ও কাজ কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

মানুষ সারা জীবন ধরে শুধুমাত্র বস্তুগত

মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুওতের বুদ্ধিগ্রাহ্য সুনিশ্চিত প্রমাণসহই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে আমাদের এই জীবনটাই সবকিছু নয়। মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন আছে যেখানে আমাদেরকে এই জীবনের সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এটা একটা সুনিশ্চিত বিষয়।

وَالنَّارِ لَا يَأْتِيهِ لَأُولَى الْأَنْبَابِ

নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবারাত্রির আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে সেই সব মানুষদের জন্য যারা চিন্তাশীল। (কুরআন, ৩: ১৯০)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ السَّيِّئَاتِ وَالْوَبَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ
আর তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য; অবশ্যই এসব কিছুই নিদর্শন সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানী। (৩০: ২২)

ইসলাম পৌরাণিক কল্পকাহিনী কিংবা মানুষের চিন্তাপ্রসূত কুসংস্কারের উপর গড়ে উঠা কোন জীবনব্যবস্থা নয়। অনুমান বা অন্ধ ধারণা নির্ভর তত্ত্বের কোন স্থান ইসলামে নেই। মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুওতের বুদ্ধিগ্রাহ্য সুনিশ্চিত প্রমাণসহই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে আমাদের এই জীবনটাই সবকিছু নয়। মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন আছে যেখানে আমাদেরকে এই জীবনের সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এটা একটা সুনিশ্চিত বিষয়।

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ফুর্তি আর ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দেয়ার জন্য এই জীবন সৃষ্টি করেননি। বরং মহান স্রষ্টার একক সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য প্রদানপূর্বক তাঁর সমস্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধানের আনুগত্য করার জন্যই আমাদের জীবন। আর এর মানে হচ্ছে, সকল মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বের হয়ে আসা। আজকের দিনে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, যা আমরা করি এবং করি না আর যে সব ধান্দায় আমরা দিনরাত ডুবে থাকি এসবই এসেছে আমাদের সমাজের প্রচলিত চিন্তাধীন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি থেকে। আমাদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হবে, আমরা যা নিয়ে ব্যস্ত, তা আমাদেরকে

ও ইন্দ্রিয় সুখের জন্য একটার পর একটা ধান্দার পেছনে ছুটে চলবে, একজন বিবেকবান মানুষের কাছে এটা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পশুদের মধ্যেও জৈবিক চাহিদা এবং প্রবৃত্তি রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকেও খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। তারাও সন্তান জন্ম দেয় এবং বিরূপ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার সন্ধান করে। কিন্তু তারপরও পশু এবং মানুষের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাণীরা নিজের অবস্থাকে উন্নত করার জন্য চিন্তা করতে পারে না। তাই আমরা দেখি মানুষের চেয়ে অনেক বড় এবং শক্তিশালী প্রাণীদেরকেও মানুষ পোষ মানায় এবং নিজের কাজে ব্যবহার করে। ফলে দুর্বল মানবজাতিই পৃথিবী শাসন করে, প্রবল শক্তিশালী প্রাণীরা নয়। মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ থাকার কারণেই মানুষ এটা করতে পারে আর তা হলো তার নিজ ও তার চারপাশের জগতকে নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা। মানুষকে অবশ্যই এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হবে এবং তার চারপাশের জগত, তার নিজের জীবন এবং অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস আর সন্তান জন্ম দিয়ে পশুর মত সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়া মানুষের কাজ হতে পারে না। তাকে অবশ্যই জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। সে কিভাবে কোথা থেকে এ পৃথিবীতে এসেছে? তার জীবনের উদ্দেশ্য কী? এই জীবনের পরে কী ঘটবে? মানুষের কিছু মৌলিক বাস্তবতা আছে যেগুলো সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। সে নিজের আকার-আকৃতি

কিংবা লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারে না। অক্সিজেন, খাদ্য-পানীয় ছাড়া বাঁচতে পারে না। নিজের জীবন ও মৃত্যুর উপরও তার বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে মৃত্যুবরণ করবে। প্রতিনিয়ত তার জীবনের শেষ দিন, শেষ মুহূর্তটির দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে। সে এই সময়টিকে এগিয়েও আনতে পারে না, পিছিয়েও দিতে পারে না। এসব অনস্বীকার্য বাস্তবতা একটা বিষয়কেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে; তা হলো মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না, বরং মানুষ নিজেই অন্যের দ্বারা সৃষ্ট এবং এমনভাবে তাকে ডিজাইন করা হয়েছে যা সে কিছুতেই পরিবর্তন করতে পারে না। ইসলাম মানুষকে তার জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাকিদ দেয়। পবিত্র কুরআনের শত শত আয়াতে মানুষকে তার চারপাশের বাস্তব জগতকে মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্বজগত তথা সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিনরাত্রির আবর্তন, প্রাণীকূল, বৃক্ষরাজি, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ও তাদের মুখের ভাষা ইত্যাদি হাজারো বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এদের মধ্যকার সুনিপুণ ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করে আল্লাহ মানুষকে চরম সত্যে উপনীত হবার জন্য আহ্বান করছেন। কুরআনুল হাকীমে আয়াতের পর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে মূক, বধির ও অন্ধের মত নিজের চারপাশে ঘটমান বাস্তবতাকে উপেক্ষা না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

বাস্তবে কতটা রক্ষা করতে পারে এবং পারবে এসব নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করি না বলেই আজকে আমরা এসব তুচ্ছ ধান্দার পেছনে অন্ধ উন্মাদের মত ছুটে চলছি। দাসত্ব করছি আমাদের নিজের খেয়াল-খুশি কিংবা অন্য মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার। ইসলাম এসেছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করার জন্য। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আর পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে উত্তম প্রতিদান। তবুও কি তোমরা বুঝবে না। (কুরআন, ৬: ৩২)

ইসলামে যদিও বা আল্লাহর দাসত্ব করে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকেই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তারপরও মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং প্রবৃত্তিকে কখনও অস্বীকার করা হয়নি। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌন চাহিদা ও সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা রেখে দিয়েছেন। আর এসব মৌলিক চাহিদা ও প্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে উত্তম আহারাদি দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা শুধুমাত্র তাকেই উপাসনা করে থাক। (কুরআন, ২: ১৭২)

আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা তোমাদের জন্য পোষাকস্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পোষাকস্বরূপ। (কুরআন, ২: ১৮৭) কিন্তু তাই বলে সব ধরনের

কামনা-বাসনার যথেষ্ট পূরণই মানবজীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আজকের সমাজে ইসলামকে বিশেষ কিছু আচারানুষ্ঠানের সমষ্টি বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা যে বিশ্বাস লালন করি তা আমাদের মধ্যে কোন চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে আসেনি, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করছি মাত্র। ফলে সারাদিনে বা সারা সপ্তাহে দু'একবার কিছু শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে আমাদের ইসলাম। যার সাথে আমাদেরও দৈনন্দিন কার্যাবলির কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এ বিষয়গুলো আমাদের সমাজের লোকদের কাছে অনেক দূরবর্তী বিষয়। কারও কারও কাছে দূর অতীতের ইতিহাস বা গল্প মাত্র। তারা মনে করে এগুলোকে গুরুত্ব দেয়া বা না দেয়া যার যার ব্যক্তিগত বিষয়; দৈনন্দিন, সামাজিক, অর্থনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে এসব বিষয় টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক। ফলে প্রতি শুক্রবারে আমরা যে দলে দলে মসজিদে যাই কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষ রমায়ানে রোযা রাখি তার কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সমাজে প্রতিফলিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানিও না কিংবা প্রশ্নও করি না বছরের পর বছর ধরে এসব আচার অনুষ্ঠান কেনইবা আমরা পালন করছি। যার ফলে আমরা পরিণত হয়েছি মডারেট ফ্রাইডে মুসলিম-এ। আসলে আমাদের জীবন চলে আমাদের নিজের ধান্দার নিয়ন্ত্রণে, ইসলামের সাথে যার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

এখন সময় এসেছে আমাদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার। আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত- কেন আমরা আমাদের ধান্দাগুলোর পেছনে এরকম অন্ধ উন্মাদের মত ছুটে চলছি। আমরা কি আমাদের জীবন ও মৃত্যুকে পাল্টে দিতে পারি? আমরা কি চিরস্থায়ী হতে পারব? কত সম্পদ হলে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারব? মহান বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অবশ্যই প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (কুরআন- ৩:

১৮৫, ২১: ৩৫, ২৯: ৫৭)

আসুন আমরা এখন থেকেই ইসলামকে জানতে চেষ্টা করি এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবন ও সমাজকে পরিচালনা করতে শুরু করি। এটা আমাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। রব্বুল আলামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (কুরআন, ৮২: ০৬)

৩৩ পৃষ্ঠার পর

জানে পরিবার হারানোর বেদনা। ওরা মুজাহিদ্দীন। ওরা ইসলামের সৈনিক। ওরা উম্মাহর ভগ্ন শরীরের ইস্পাত কঠিন মনোবল। ওরা কালিমার কালো পতাকা নিয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

মাযলুম মানুষগুলোর স্থানে কখনো কি নিজেকে রেখেছেন? ওদের চোখ দিয়ে দেখুন, ওদের কান দিয়ে শুনুন। ওদের অন্তরটা দিয়ে অনুভব করুন। সত্য বুঝতে পারবেন। ইতিহাস ৯/১১ এ শুরু হয়নি। ইতিহাসের সূচনা অনেক আগেই হয়ে গেছে- ইরাকে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে। মীর, সবুজ, মুমিনা, হাসিব, প্রান্তের মতো অজানা কত জীবনের ইতিহাস। হয়তো সেসব আপনার অজানাই রয়ে যাবে। হয়তো ওদেরকে খুনি বলে আপনার সামনে সভ্য জগতের মিডিয়া হাজির করবে। হাজির করবে না পেছনের সত্যটুকু। আপনি মিডিয়াকেই বিশ্বাস করবেন। জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী বলে গাল দিবেন তাদেরকে- যারা নিজেদের রক্ষা করতে, মুসলিম ভাই-বোনদের সম্বল রাখতে, পৃথিবীর বুকে ইসলামের ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করতে, আপনাকে উপহার দিতে বসবাসযোগ্য সুন্দর একটা পৃথিবী- জানবাজি রেখে লড়াই করে চলেছে। চোখের রঙ্গিন চশমাটা খুলুন। একবার তাদের চোখ দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখুন। একবার সাহসী হোন। একবার স্বপ্ন দেখুন। এবার আপনি কাকের-মুসলিমের চলে আসা সুদীর্ঘ এ লড়াইয়ে আপনার অবস্থানটা নির্ধারণ করুন।



পাত্রী চাই!

মুনীরাহ মানসূরাহ রুবি

এক.

গবেষণায় দেখা গেছে—
সবচেয়ে কাক্ষিত পাত্রী
সে যার গায়ের রং
ফর্সা। ৪৪৬টি
বিজ্ঞাপনের মধ্যে
২২০টি বিজ্ঞাপনে
অর্থাৎ ৪৯.৩২ ভাগ
বিজ্ঞাপনে সরাসরি
ত্বকের রং ফর্সা উল্লেখ
করা হয়েছে। মাত্র
১৩টি বিজ্ঞাপনে
পাত্রীপক্ষ পাত্রীর
শ্যামলা রঙ্গের কথা
উল্লেখ করেছে।
সুন্দরী, প্রকৃত সুন্দরী,
অসামান্য রূপসী,
রূপসী, অপূর্ব সুন্দরী
এই ধরনের বিশেষণ
ব্যবহার করে
সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপিত
করা হয়েছে ২২২টি
বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ ফর্সার
চেয়েও বেশি, ৪৯.৭৬
ভাগ বিজ্ঞাপনে।
অপরদিকে পাত্রীপক্ষ
একটি মাত্র বিজ্ঞাপনে
সুদর্শন পাত্র চেয়েছেন।

ভাই, আমার শালার জন্য একটা পাত্রী
দরকার। আপনার জানাশোনা কেউ
থাকলে বলবেন। খালাম্মা, আপনার
জানাশোনা কোন পাত্রী আছে?
বিয়ে-শাদিটা এবার করেই ফেলব।
বিবাহ করতে ইচ্ছুক যুবক বা বিবাহ
দিতে ইচ্ছুক যুবক-যুবতীর
অভিভাবকের কাছ থেকে এই টাইপের
কথার সম্মুখীন মোটামুটি তরুণ থেকে
শুরু করে মুরুবি আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধু-বান্ধব সবারই হতে হয়।
বিয়ে এবং বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি
সমাজ-জীবনের একটা অপরিহার্য
অংশ। আর উভয় পক্ষের আশা
ভরসার প্রতীক ঘটক কিংবা মুখরা
প্রাণচঞ্চল কোন আত্মীয়। আবার কেউ
কেউ একটু আগ বাড়িয়ে মিডিয়া বা
দৈনিক পত্রিকার শরণাপন্নও হয়ে
থাকেন।
একজন বিবাহযোগ্য পাত্রীর মধ্যে কী
কী গুণ তার ভাল পাত্রী হওয়ার
মাপকাঠি? এই একটি প্রশ্নের উত্তর
বের করতে পারলেই বের হয়ে যায়
সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আসল
স্বরূপ। যেহেতু আমাদের সমাজে
একটি মেয়ে জন্মের পর থেকেই তাকে
পাত্রস্থ করার জন্য তৈরি করা হয়
সুতরাং সমাজের কাছে উপযুক্ত বিয়ের
পাত্রীর আদর্শ মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায়
সমাজে নারীর অবস্থান, এই নারী

স্বাধীনতার যুগে কোন্ পর্যায়ে আছে!
দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিবাহ-বিজ্ঞাপন
পাত্র/পাত্রী চাই এর উপর গবেষণা
করেছেন ডক্টর কাবেরি গায়েন। ১৯৯৯
সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত
প্রকাশিত ৪৪৬টি বিবাহ-বিজ্ঞাপনের
উপর এই গবেষণা করেন তিনি। তার
এই অসাধারণ গবেষণায় উঠে এসেছে
সমাজে নারীর মূল্যায়নের এক
বাস্তবিক উপাখ্যান।
গবেষণায় দেখা গেছে— সবচেয়ে
কাক্ষিত পাত্রী সে যার গায়ের রং
ফর্সা। ৪৪৬টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে
২২০টি বিজ্ঞাপনে অর্থাৎ ৪৯.৩২ ভাগ
বিজ্ঞাপনে সরাসরি ত্বকের রং ফর্সা
উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র ১৩টি
বিজ্ঞাপনে পাত্রীপক্ষ পাত্রীর শ্যামলা
রঙ্গের কথা উল্লেখ করেছে। সুন্দরী,
প্রকৃত সুন্দরী, অসামান্য রূপসী,
রূপসী, অপূর্ব সুন্দরী এই ধরনের
বিশেষণ ব্যবহার করে সৌন্দর্যকে
বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে ২২২টি
বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ ফর্সার চেয়েও বেশি,
৪৯.৭৬ ভাগ বিজ্ঞাপনে। অপরদিকে
পাত্রীপক্ষ একটি মাত্র বিজ্ঞাপনে সুদর্শন
পাত্র চেয়েছেন।
অর্থাৎ পাত্রী এবং পাত্রপক্ষ নির্বিশেষে
সকলেই মনে করে বিয়ের পাত্রীকে
অবশ্যই সুন্দরী হতেই হবে। কিন্তু
পুরুষের সৌন্দর্য নিয়ে অন্তত পাত্রী
পক্ষের মাথা ব্যথা নেই। মোট ৮৬ টি

বিজ্ঞাপনে সরাসরি লম্বা-স্মিম বিশিষ্টক ব্যবহার করা হয়েছে। যা দৈহিক সৌন্দর্যের একটি সূচক। শুধু তাই নয়, পাত্রীর কাক্ষিত উচ্চতাও বলে দেওয়া হয়েছে ইঞ্চি-ফুট সমেত।

আরেকটি সূচক স্বাস্থ্যবতী। অর্থাৎ কোনভাবেই মেয়েটির দৈহিক সৌন্দর্যের কোন দিকই যেন ভুলক্রমে বাদ না পড়ে, তাই ৪৯.৭৬ শতাংশ বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে চাওয়া হয়েছে। ৪৪৬টি বিজ্ঞাপনের মাত্র ৪৪টিতে নম্র, ভদ্র ও মার্জিত পাত্রী চাওয়া হয়েছে, অবশ্য সুন্দরীও হতে হবে সেই পাত্রীকে। মোট ৪৮টি বিজ্ঞাপনে ধার্মিক মেয়ে চাওয়া হয়েছে, যা শতকরার হিসেবে মাত্র ১০%!

১০০ বছর আগেকার এমা গোল্ডম্যানের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা মনে আছে নিশ্চয়। তিনি বলেছিলেন, পুরুষের আয় আর নারীর রূপ-লাবণ্য, এর চেয়ে বেশি কী জানবার আছে?

গবেষণার সুবিধার জন্য যদিও সুন্দরী, ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এসব ভাগে ভাগ করা হয়, কিন্তু মূলকথা একটাই দাঁড়ায়— সেটা হলো দৈহিক সৌন্দর্য। আর এগুলো হচ্ছে ভাষার অলংকার, এই অলংকার তোলে নিলে যা থাকে তা হলো নারীর দেহ।

বিয়ের বাজারে নারী এক ধরনের পণ্য। এই পণ্যের দাম নির্ভর করে অন্য পণ্যের সাথে তুলনায় কত সুন্দর সেই হিসেবে। আর যে ছেলের পকেট যত ভারী, সে বাজার থেকে তত বেশি দামের সুন্দর পণ্যটি তুলে নিতে পারবে।

সবাই ফর্সা মেয়ে চায়। কারণ বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার প্রকোপে ফর্সা মানেই সুন্দর এই ধারণা আজ প্রায় প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গেঁড়ে বসেছে। সব সমাজেই দেখা যায় কালো মেয়েরা সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অদৃশ্য। অথচ নির্যাতনের একদম কেন্দ্রবিন্দু। গবেষক কাবেরি গায়নের মতে— তারা সমাজের তলানি।

মলয় রায় চৌধুরীর মতে— একটি পরিবার যত ধনী হতে থাকে, ফর্সা

আপনি মনজুড়ানো সুন্দরী বৌ খুঁজছেন? এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো, যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নয়, অনেক বড় ঘরেরও নয়, কিন্তু তিনি আল্লাহকে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখেন, যিনি পৃথিবীর যেকোন মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসেন ও ভয় করেন। হয়ত জান্নাতে দিগন্ত বিস্তৃত রাজত্ব থাকবে তার। আপনি কি দীনদারি ভুলে রূপকেই হিসেব করছেন? এই ছোট্ট ভুলের মাশুল জীবনভর গুণতে রাজি আছেন তো?

নারীর সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। কালো মেয়ের সংখ্যাধিক্য হয় দরিদ্র পরিবারে। ফর্সা মানে অভিজাত, কালো মানে অনভিজাত। ফর্সা মানে দেবী, আর কালো মানে অসুরকন্যা। সিনেমা থিয়েটারে কেনই বা কালো নায়িকা দরকার হলে ফর্সা সুন্দরী নায়িকাকে কালো রং মাখিয়ে নামানো হয়! কালোর কাছে ফর্সা হলো পিতৃতান্ত্রিক।

দুই.

এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নয়!

ভাই, আপনি মনজুড়ানো সুন্দরী বৌ খুঁজছেন? এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো, যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নয়, অনেক বড় ঘরেরও নয়, কিন্তু তিনি আল্লাহকে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখেন, যিনি পৃথিবীর যেকোন মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসেন ও ভয় করেন। হয়ত জান্নাতে দিগন্ত বিস্তৃত রাজত্ব থাকবে তার। আপনি কি দীনদারি ভুলে রূপকেই হিসেব করছেন? এই ছোট্ট ভুলের মাশুল জীবনভর গুণতে রাজি আছেন তো?

বোন, খুব আরাম-আয়েশে থাকার জন্য তুমি বেশ ভালো সম্পদওয়ালা ছেলে খুঁজছ? অনেক ঠকঠকে-চকমকে প্রোফাইলের কাউকে খুঁজতে গিয়ে এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছ না তো, যে হয়ত সাধারণ একটা জীবনযাপন করছে, কিন্তু চরিত্রবান, ব্যবহারে কোমল এবং ইসলামকে ভালবাসে ও সেই মোতাবেক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করতে চায়? আখিরাতে সে জান্নাতে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে। জান্নাতে তার থাকবে

বিশাল রাজত্ব, হয়ত দুনিয়াতে নয়। চরিত্র আর সততা ফেলে কি সম্পদকেই মূল্য দিচ্ছ? এই ভুল করে জীবনভর আফসোস করতে প্রস্তুত আছো তো?

বিয়ের ক্ষেত্রে দীনদারিই হোক আমাদের মুসলিমদের অন্তরের গভীর থেকে চাওয়া। মুখের মিষ্টি কথা হিসেবে নয়, প্রকৃত 'আরজি' হোক এটাই। আল্লাহ উত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দিবেন ইনশা-আল্লাহ।

তিন.

মনের মতন মানুষ খুঁজছেন বিয়ের জন্য?

আল্লাহ হয়ত আপনাকে এমন কাউকে দিবেন না, যে সম্পূর্ণ নিপুণ; কেননা এমন মানুষ নেই পৃথিবীতে। আপনি যেমন চান, ঠিক তেমন মানুষই আপনি পাবেন এটাও অবাস্তব। কেননা মানুষ অর্ডার দিয়ে বানানো যায় না। কিন্তু আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী একজন জীবনসঙ্গী খুঁজতে চেষ্টা করলে, হৃদয়টাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখলে তিনি হয়তো আপনাকে এমন একজন এনে দিবেন, যে আপনার জন্য সবচেয়ে অসাধারণ!

ভেবে দেখুন, আপনি নিজেই কি নিখুঁত? আপনার দোষগুলো ভেবে দেখেছেন? সেগুলো আপনার 'সবদিক দিয়ে পছন্দ' হওয়া মানুষটি কি সহ্য করতে পারবে? বরং যিনি আপনাকে মেনে নিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সময়টুকু আপনার সঙ্গী হয়ে আখিরাতে অনন্তকালে আপনার সঙ্গী হতে চান— তাকেই সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয়, মনের মতন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করুন।

পৃথিবীতে জান্নাতের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে ভরে ফেলবেন না। নিখুঁত, ঝামেলাহীন, যন্ত্রণাহীন, শান্তিই শান্তি... এই বিষয়গুলো কেবল জান্নাতেই সম্ভব। বরং আল্লাহকে ভালবাসে, ইসলামকে জানা মাত্রই মানতে চায় এমন একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে নিন এবং তার সাথে ক্ষণস্থায়ী এই অনিপুণতায় ভরপুর পৃথিবীর সময়টা কাটিয়ে নিপুণ জান্নাতে পা রাখতে চেষ্টা করুন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত দুআ শোনেন। আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে চাইতে থাকুন, তিনি আপনাকে আপনার জন্যও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিবেন। আল্লাহ আমাদের ভাই ও বোনদের উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করুন।

চার.

চরিত্রবান নেককার স্ত্রী হলো আপনার জীবনের কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ সম্পদ কী, তা কি সবাই বুঝি? পুরুষেরা অনেক সময় সম্পদ অর্জনের জন্য এখানে-ওখানে খুঁজে অস্থির হয়ে যায়, নিজ ঘরের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। টাকা-কড়িই কি কেবল সম্পদ? সেই সাথে বাড়ি-ঘর আর জমি-জমা-গাড়ি? শুধু অর্থসম্পদ কি আপনাদের সন্তানদের সুসন্তান করে গড়ে তুলতে পারবে? সন্তানেরা কার তত্ত্বাবধানে আর যত্নে বড় হয়, তা ভেবেছেন?

হে ভাই, জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে ভেবে দেখেছেন? একটা পরিবারে একজন নারী হলো সংসারের স্থপতি। তার হাতের নিবিড় পরিচর্যায় বড় হয় আপনার সন্তানেরা। যখন আপনি জীবিকার তাকিদে বাইরে ব্যস্ত থাকেন, তখন সে আগলে রাখে সংসারটিকে। সে আপনার চিন্তার প্রভাবক। চাই তা ভাল চিন্তা হোক আর ভুলই হোক, দুনিয়াবি চিন্তা হোক বা হোক আখিরাতের চিন্তা।

অল্প সম্পদকেও অনেক বেশি সম্পদ মনে হতে পারে যখন একজন ভাইয়ের জীবনসঙ্গিনী তার যা আছে সেগুলোতেই সন্তুষ্ট থেকে তাকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে অর্থ উপার্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টাটুকু

করতে উৎসাহ দেয়। তখনই আপনার সবকিছু সুন্দর হবে। ছোট ঘরটিকেও বড় মনে হবে। পায়রার খোপটাকেই মনে হবে মুক্ত আকাশ। কষ্টের জীবনটাকেও আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা হিসেবে সহনীয় আর কল্যাণকর হিসেবে খুঁজে পাবেন যখন দীনদার স্ত্রী আপনার সঙ্গী হবেন এবং আপনিও যখন দীনদার স্বামী হিসেবে তার যোগ্য জীবনসঙ্গী হবেন।

প্রকৃত সম্পদ কী তা বুঝে নিতে তাই ভুল হয় না যেন কখনো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেককার স্ত্রী।

পাঁচ.

উমর (রাঃ) এর পুত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন।

উমর (রাঃ) জনসাধারণের সঠিক অবস্থা জানার জন্য রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। এক রাতে একটি ছোট কুটিরের সামনে এলে তিনি বাড়ির ভেতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, 'দুধের সাথে পানি মিশাও। ভোর হয়ে এলো।' মেয়েটি উত্তর দিলো, 'না মা, উমর (রা.) দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন।'

মা বললেন, 'উমর দেখতে পেলে তো?' মেয়ে বলল, 'আমি প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব, আর গোপনে তাঁর অবাধ্যতা করব? আল্লাহর কসম! এটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলল, উমর (রা.) হয়ত আমাদেরকে দেখেছেন না, কিন্তু তাঁর রব তো আমাদেরকে দেখেছেন! গোপনে সব শুনে উমর (রা.) বাড়িটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। পরে তার ছেলে আসেমের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দিলেন। তার গর্ভে দু'টি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, যাদের একজনের গর্ভে উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর জন্ম হয়েছিল। (তারীখে মাদীনাতে দামেশুক ৭/২৫৩)

ভবে দেখুন, আপনি নিজেই কি নিখুঁত? আপনার দোষগুলো ভেবে দেখেছেন? সেগুলো আপনার 'সবদিক দিয়ে পছন্দ' হওয়া মানুষটি কি সহ্য করতে পারবে? বরং যিনি আপনাকে মেনে নিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সময়টুকু আপনার সঙ্গী হয়ে আখিরাতের অনন্তকালে আপনার সঙ্গী হতে চান- তাকেই সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয়, মনের মতন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করুন।

পৃথিবীতে জান্নাতের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে ভরে ফেলবেন না। নিখুঁত, ঝামেলাহীন, যন্ত্রণাহীন, শান্তিই শান্তি... এই বিষয়গুলো কেবল জান্নাতেই সম্ভব।



ঈদের করণীয় ও বজায় দিকসমূহ

হাদীস নাসিহ ইবনে হাম্মাদ আল-ফাহহাদ

সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর থেকে ঈদের সালাতের সময় আরম্ভ হয় এবং দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এ সালাত আদায় করা যায়। ঈদুল আযহার সালাত একটু আগে পড়া উত্তম। যেহেতু এরপর পশু কুরবানি করতে হয়। আর ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরিতে পড়া উত্তম, যাতে লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে ঈদগাহে আসতে পারে। (ফিকহুস সুন্নাহ-খ. ১, ৫২৮)

ঈদ (ঈদ) শব্দটি عِيد (আওদুন) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে, বার বার ফিরে আসা। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার এ দু'টি দিন প্রতি বছর ফিরে আসে বিধায় এ দু'টি দিনকে ইসলামি শরিয়তে ইয়াওমুল ঈদ বা ঈদের দিন বলা হয়েছে। তাছাড়া ঈদের অন্য অর্থ হচ্ছে, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। মুসলিম সমাজ এ দু'টি দিন তাদের জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করে এবং আনন্দ করে, তাই এ দিনগুলোকে ঈদের দিন বলা হয়।

বিশ্বনবী (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে প্রথম ঈদের সালাত আদায় করেন। নবী (সা.) বলেছেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا
হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতিরই আনন্দোৎসব রয়েছে। আর আমাদের আনন্দোৎসব হচ্ছে এটা (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা)। (মুসনাদে আহমাদ: ২৫৫৭৫, বুখারি: ৯৫২, মুসলিম: ২০৯৮, ইবনে মাজাহ: ১৮৯৮, বাইহাকি: ২০৮০১, মিশকাত: ১৪৩২)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় এলেন, তখন এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে দুটি উৎসব ছিল, যাতে তারা আনন্দ করত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে প্রশ্ন করেন, এই দু'দিনে তোমরা কী কর? তারা বলল, আমরা ইসলাম আগমনের পূর্বে এ দু'দিন আনন্দোৎসব করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ তাআলা ওগুলোর পরিবর্তে আরো উত্তম কিছু দান করেছেন। একটি হলো রোযা ভাঙ্গার আনন্দের দিন “ঈদুল ফিতর” আর অপরটি হলো কুরবানির দিন “ঈদুল আযহা”। (সুনানে নাসাই:

১৫৫৬, মুসনাদে আহমাদ: ১২৮৫০)। শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য যে দুটো দিন ছিল আল্লাহ তাআলা তা পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, তার যিকির, তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার সাথে সাথে শালীন আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সজ্জা ও খাওয়া-দাওয়া করা হয়। আর এ দুদিনই হচ্ছে কেবলমাত্র মুসলমানদের জাতীয় উৎসব। সুতরাং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির নবোদ্ভাবিত কোনো কুফরি-শিরকি উৎসবে মেতে উঠা মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ঈদের দিন করণীয়

ঈদের দিন সকালে গোসল করা :

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। কেননা এ দিনে সকল মানুষ সালাত আদায়ের জন্য মিলিত হয়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَمْرِ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

নাফে (রহ.) হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। (মুয়াত্তা মালিক: ৪২৬, বায়হাকি সুনানে কুবরা: ৬৩৪৪, মুসনাদে শাফেঈ: ৩২২, মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক: ৫৭৫৩)

শালীনতা বজায় রেখে যথাসম্ভব উত্তম পোশাক পরিধান করা :

আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করণার্থে ঈদের দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা ভাল। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

আমর ইবনে শূয়াইব (রহ.) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার উপর তার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিযি: ২৮১৯, জামেউস সগীর: ২৭২৮, সিলসিলা সহীহা: ১২৯০, মিশকাত: ৪৩৫০)

ঈদুল আযহার দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া :

বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন কুরবানির পর কুরবানির গোশত দ্বারা আহার করতেন। (তিরমিযি: ৫৪২, ইবনে মাজাহ: ১৮৫৬, ইবনে খুযাইমা: ১৪২৬, ইবনে হিব্বান: ২৮১২, মুস্তাদরাকে হাকেম: ১০৮৮, মিশকাত: ১৪৪০)

পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া :

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَقْلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ غَيْرِ.

আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ অনুযায়ী আমল করেন এবং তাদের মত হলো, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাবে এবং ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে নিবে। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন, মুস্তাহাব হচ্ছে, গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া যানবাহনে আরোহণ করবে না। (তিরমিযি: ৫৩০)

ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় পথ পরিবর্তন করা :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِ خَالَفَ الطَّرِيقَ

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন অর্থাৎ এক পথে যেতেন এবং অন্য পথে আসতেন। (বুখারি: ৯৮৬, শারহুস সুন্নাহ: ১১০৮, জামেউস সগীর: ৮৯০৭, মিশকাত: ১৪৩৪)

ঈদের দিন তাকবির পাঠ করা :
নিচের বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাকবির পড়তে হয় :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَحْمَدُ

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ

সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (উমদাতুল কারি- খ. ১০, পৃ. ৩১০)

ঈদের সালাত

সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর থেকে ঈদের সালাতের সময় আরম্ভ হয় এবং দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এ সালাত আদায় করা যায়।

ঈদুল আযহার সালাত একটু আগে পড়া উত্তম। যেহেতু এরপর পশু কুরবানি করতে হয়। আর ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরিতে পড়া উত্তম, যাতে লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে ঈদগাহে আসতে পারে। (ফিকহুস সুন্নাহ-খ. ১, ৫২৮)

ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে নফল সালাত নেই :

রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করেননি। হাদীসে এসেছে,

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন। এর পূর্বে বা পরে কোনো (নফল) সালাত আদায় করতেন না। (বুখারি: ৯৬৪, মুসলিম: ২০৯৪, তিরমিযি: ৫৩৭, নাসাই: ১৫৮৭)

তবে যদি কোন অসুবিধার কারণে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করতে হয় তাহলে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করা যেতে পারে।

ঈদের সালাতে আযান ও ইকামাত নেই :

ঈদের সালাতের জন্য কোনো আযান নেই এবং এতে কোন ইকামাতও নেই। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

ইবনে আব্বাস (রা.) ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার সালাতে আযান বা ইকামাত দেয়া হতো না। (বুখারি: ৯৬০, মুসলিম: ১১৯০, তিরমিযি: ৫৩২, আবু দাউদ: ১১৪৮, ইবনে মাজাহ: ১২৭৪)

ঈদের সালাতের পূর্বে কোন খুতবা নেই

ঈদের সালাতের পূর্বে কোন ওয়ায-নসীহত বা খুতবা দেয়া যাবে না। ইমাম সাহেব ঈদগাহে এসে প্রথমে সালাত শুরু করে দেবেন। অতঃপর সালাত শেষে লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত বা খুতবা প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। ঈদগাহে প্রথম সালাত শুরু করতেন। সালাত শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন। খুতবায় তিনি তাদের ওয়ায করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মানুষেরা তাদের কাতারে বসে থাকতো। (বুখারি: ৯৫৬, বাইহাকি: ৫৯২৯, মিশকাত: ১৪২৬)

ঈদের সালাতের মুস্তাহাব কিরাত :

عَنِ الثَّغَفَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَفْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَ «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَفْرَأُ بِهِنَّ أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

নুমান ইবনে বাশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দু' ঈদের সালাতে ও জুমআর সালাতে “সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আলা” ও “হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ” সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমআ একই দিনে হলেও তিনি উভয় সালাতে ঐ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। (মুসলিম: ২০৬৫, আবু দাউদ: ১১২৪, তিরমিযি: ৫৩৩, নাসাই: ১৫৬৮, ইবনে হিব্বান: ২৮২২, মিশকাত: ৮৪০)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» وَ «إِفْتَرَسَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ»

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবু ওয়াকিদ আল লাইসী (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, নবী (সা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কী কিরাত পড়তেন? তখন তিনি বললেন, নবী (সা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে সূরা “কাফ ওয়াল কুরআ-নিল মাজীদ” এবং

“ইকতারাবাতিস সা-‘আতু ওয়ান শাক্কাল কামার” পাঠ করতেন। (মুয়াত্তা মালিক: ৪৩৩, মুসলিম: ২০৯৬, আবু দাউদ: ১১৫৬, মিশকাত: ৮৪১)

ঈদের খুতবা

ঈদের সালাতের পর ইমাম খুতবা দেবেন। সে খুতবায় তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রশংসা, গুণগান ও অধিক পরিমাণে তাকবির পাঠ করবেন এবং দীনি শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা করবেন। মুসল্লিরা মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ فُلَانًا قَطَعَ الصَّلَاةَ قَالَ إِلَّا لَخَطْبٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ঈদে উপস্থিত হলাম। অতঃপর যখন তিনি (ঈদের) সালাত আদায় করা শেষ করলেন তখন বললেন, নিশ্চয় আমরা খুতবা দেবো। অতএব খুতবা (শ্রবণ) এর জন্য যে বসা পছন্দ করে সে যেন বসে থাকে এবং যে চলে যেতে ইচ্ছা করে সে যেন চলে যায়। (আবু দাউদ: ১১৫৭, ইবনে মাজাহ: ১২৯০, মুস্তাদরাকে হাকেম: ১০৯৩, জামেউস সগীর: ৪০৫৩)

শুভেচ্ছা বিনিময়

ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয আছে। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) জুবায়ের ইবনে নাবী (রহ.) থেকে হাসান হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন সূত্রে বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ ঈদের দিন সাফাৎকালে একে অপরকে বলতেন,

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

আল্লাহ আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন। (ফাতহুল বারী, ২/৪৪৬ পৃঃ)

‘ঈদ মুবারক’ বলেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। তবে প্রথমে উল্লেখিত বাক্য দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা উত্তম। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ বাক্য ব্যবহার করতেন এবং এতে রয়েছে পরস্পরের জন্য কল্যাণ কামনা ও আল্লাহ রাসূল আলামীনের কাছে দুআ।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও

তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকল প্রকার মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ একটা বিরাট সুযোগ। এসময় তাদের খোঁজ খবর নেয়া উচিত। কেননা হিংসা বিদ্বেষ ও

আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ঈদের দিন মুআনাকা করা :

ঈদের দিন মুআনাকা করার খাস কোন দলিল নেই। তবে সুন্নাত মনে না করে যদি কেউ মুআনাকা করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। সাহাবীগণ পরস্পর সাফাৎ করলে মুসাফাহা করতেন এবং সফর থেকে ফিরে আসলে মুআনাকা করতেন। (সিলসিলা সহীহাহ: ২৬৪৭)

আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া

আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকল প্রকার মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ একটা বিরাট সুযোগ। এসময় তাদের খোঁজ খবর নেয়া উচিত। কেননা হিংসা বিদ্বেষ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شِقَاقٌ فَيُشَالُ أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلَّيَا أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلَّيَا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সোম ও বুধস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাকে ব্যতীত সে দিন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু ঐ দু’ভাইকে ক্ষমা করা হয় না, যাদের মাঝে হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে—যতক্ষণ না নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে নেয়। বলা হয়, এ দুজনকে অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়। এ দু’জনকে অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়। এ দু’জনকে অবকাশ দাও, যেন তারা

নিজেদের দ্বন্দ্ব বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়। (মুয়াত্তা মালিক: ১৬১৮, মুসলিম: ৬৭০৯, আবু দাউদ: ৪৯১৮, তিরমিযি: ২০২৩)

ঈদের দিন কবর যিয়ারতের বিধান
কবর যিয়ারত করা শরিয়ত সমর্থিত আমল। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ بَرْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ زَيْنَةَ الْقَيْسِ قَرُورُهَا

ইবনে বুরাইদা (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ- এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পারো। (মুয়াত্তা মালিক: ১০৩১, মুসলিম: ২৩০৫)

কিন্তু ঈদের দিন কবর যিয়ারতকে অভ্যাসে পরিণত করা বা একটা প্রথা বানিয়ে নেয়া শরিয়তসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَا تَجْعَلُوا يَوْمَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورَ عَيْنًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করবে না এবং আমার কবরে ঈদ উদযাপন করবে না। (আবু দাউদ: ২০৪৪, মিশকাত: ৯২৬)

ঈদে বর্জনীয় কাজসমূহ

ঈদ হলো আল্লাহ রাসূল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। আনন্দ মানে সীমালঙ্ঘনের স্বাধীনতা নয়। মুসলিমের প্রতিটি কাজই হবে আল্লাহর দেখানো পন্থায়। কিন্তু অনেক মুসলিম এ দিনটিকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না। তারা এ দিনে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে এ ধরনের কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বর্তমান সময়ে মানুষের কাছে গান-বাজনা অতি সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটি একটি বড় ধরনের গোনাহের কাজ। আর ঈদের দিনে এ গোনাহের কাজটা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। দেখে মনে হয় যেন এটি কোন মুসলিম সমাজের উৎসব নয়, বরং অন্য কোনো সম্প্রদায়ের জাতির আনন্দোৎসব। অথচ ইসলামি শরিয়তে গান ও বাদ্যযন্ত্রের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করা :

মুসলিম সমাজের অনেকে চাল-চলনে অমুসলিমদের অঙ্ক অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (আবু দাউদ: ৪০৩৩, মুসনাদে বাযযার: ২৯৬৬, জামেউস সগীর: ১১০৯৪, মিশকাত: ৪৩৪৭)

পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ ও মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ :

পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ ও মহিলার পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। অথচ ঈদের দিন এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ সকল মহিলাকে অভিশম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সকল পুরুষকেও অভিশম্পাত করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। (বুখারি: ৫৮৮৫, আবু দাউদ: ৪০৯৯, ইবনে মাজাহ: ১৯০৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩১৫১, জামেউস সগীর: ৯২৩১, মিশকাত: ৪৪২৯)

পর্দা লঙ্ঘন করা :

মহিলাদের খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তাঘাটে বের হওয়া ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ তাআলা নারীদের বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহেলি যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন কও বেড়িও না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। (সূরা আহযাব- ৩৩)

হাদীসে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - نِسَاءُ كَاسِيَاتٍ غَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ زُجْجَ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجُنَّ رِيحُهَا وَإِنْ رِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অচিরেই এমন একদল মহিলার আগমন ঘটবে, যারা পোশাক পরিধান করেও যেন উলঙ্গ থাকে। তারা অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং তারাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি এতো এতো দূর থেকে পাওয়া যাবে। (সহীহ মুসলিম: ৫৭০৪, সিলসিলা সহীহাহ: ১৩২৬, মিশকাত: ৩৫২৪)

অনেককে দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে ঈদের দিন গোনাহের কাজ বেশি করে। নিকট আত্মীয়ের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা শরিয়ত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كُنَّ الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْخَمُوقَ قَالَ الْخَمُوقُ الْمَوْتُ.

উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে। আনসারী

সাহাবীদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তরে বললেন, দেবর-ভাসুর তো মৃত্যুর সমতুল্য। (বুখারি: ৫২৩২, মুসলিম: ৫৮০৩)

এমনসব আত্মীয়, যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম যেমন- স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এসকল আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই বে-পর্দাজনিত বিপদ বেশি ঘটে থাকে। অথচ এ বিষয়ে আমাদের সমাজ খুবই অসতর্ক।

গান-বাজনা করা :

বর্তমান সময়ে মানুষের কাছে গান-বাজনা অতি সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটি একটি বড় ধরনের গোনাহের কাজ। আর ঈদের দিনে এ গোনাহের কাজটা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। দেখে মনে হয় যেন এটি কোন মুসলিম সমাজের উৎসব নয়, বরং অন্য কোনো সম্প্রদায়ের জাতির আনন্দোৎসব। অথচ ইসলামি শরিয়তে গান ও বাদ্যযন্ত্রের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

আমার উম্মতের মাঝে এমন একটা দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি পোশাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। (সহীহ বুখারী: ৫৫৯০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬৭৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বাযহাকী: ৬৩১৭, জামেউস সগীর: ৯৫৯৭, সিলসিলা সহীহাহ: ৯১, মিশকাত: ৫৩৪৩)

আল্লাহ তাআলা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দান করে মুসলিম উম্মাহকে এর মাধ্যমে জাহেলি ঈদ বা উৎসব থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলিমদের ঈদ হলো ইবাদাত, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে। আর কাফিরদের ঈদ ও উৎসব এর বিপরীত, সেখানে কুফর ও গোমরাহীর প্রদর্শন হয় এবং বিভিন্ন শয়তানি কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাই বছরের অন্য দিনের মতো ঈদের দিনও শয়তানি কাজ বর্জন করা মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য।

আনতে হবেই চাঁদ!

ইসমাইল হোসেন দিনাজী

ঈদের খুশি কোথায় গেল কোথায় ঈদের চাঁদ
চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেন ক্লাস্তি অবসাদ।
দখিন হাওয়ায় বেসুর বাজে গায় না পাখি গান
নিঝুম কালো দীঘল রাতের হয় না অবসান।
জালিমশাহির কয়েদখানায় ঈদের হেলাল বন্দি
কালোর সঙ্গে আলোর কভু হয় না তো ভাই সন্ধি।
আঁধার এবং আলোর মাঝে চলছে তুমুল যুদ্ধ,
চাঁদ-সেতারা কার ইশারায় বিনা দোষেই রুদ্ধ?
গোমড়ামুখো আকাশকোণে মেঘের আনাগোনা
পায় না খুঁজে ঈদের খুশি নতুন চাঁদের সোনা।
নতুন জামা নতুন টুপি আতর আতর গন্ধ
সবই আছে তবু যেন স্তব্ধ খুশির ছন্দ!
ঈদের খুশি উড়ছে দেখো প্রজাপতির ডানায়
ঈদগাহে আজ খুশির মেলা চাঁদ ছাড়া কি মানায়?
খুশির দিনে সবার মাঝে চাঁদটা নেমে আসুক,
সবকে ভালবাসুক সকল দুঃখ-জ্বরা নাশুক।
ভাঙতে হবে জেলের তালা আনতে হবেই চাঁদ
চলতে পথে দলতে হবেই পাহাড় সমান বাঁধ।

আজকে জাতির ঘুম ভেঙেছে

মুসাফির সাদিক হিযবুল্লাহ

আজকে জাতির ঘুম ভেঙেছে নয় কেহ গাফেল।
বন্দি মুজাহিদ করবো মুক্ত ভেঙ্গে যালিমের জেল।
বাংলার বুকে অচিরেই হবে ইসলামি বিপ্লব।
পালানোর পথ পাবে না খুঁজে বাতিল যত সব।
অনেক সয়েছি নির্যাতন হয়ে মোরা মাযলুম।
নির্যাতনের ভয়াবহতায় আজ ভেঙেছে ঘুম।
তায়েফাতুল মানসুরায় আজ হচ্ছে সবাই জড়ো।
চারদিক হতে উঠছে যে ডাক, তাগুত খতম করো।
যত আছে কাফির, মুশরিক, গাদ্দার-মুনাফিক।
পালানোর পথ খুঁজে তোরা পারি না যে ঠিক।
আল্লাহ ছাড়া কাউকে মোরা করি নাকো ভয়।
কথা হবে বুলেটে এবার, ব্যালটে আর নয়।
যারা বলে নফসের জিহাদ, জিহাদ কলম কাগজে।
চায় না তারা দীন কায়েম হোক আবার এ সমাজে।
তাদের ধোঁকায় আমরা কেউ আর থাকবো না গাফেল।
বন্দি মুজাহিদ করবো মুক্ত ভেঙ্গে যালিমের জেল।

মিলাও হাতে হাত

হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

দীন কায়েমের জন্য মোরা
করব জিহাদ অবিরত,
রবের সন্তোষ পেতেই হবে
আসুক বাধা যত।
দুনিয়ায় আজ নেইতো কায়েম
রবেরই বিধান,
মুসলিমরা তাইতো আজ
হারিয়েছে মান।
কাফিরের ঐ অত্যাচারে তারা
আজ ক্ষত-বিক্ষত,
মুক্তির আশায় দিকে দিকে
কাদে অবিরত।
আল্লাহর কাছে মর্যাদায়
শ্রেষ্ঠ শাহাদাত,
তাইতো দিবেন বিনিময়ে
শেষ নিয়ামাত।
দীন কায়েমের পথ একটাই
জিহাদ আল-জিহাদ,
ফিরিয়ে আনতে হারানো দিন
মিলাও হাতে হাত।
ছুড়ে ফেলো সব তাগুতের ঐ
ভ্রান্ত পথ যত,
তাগুতেরই সঙ্গে কভু আপোষ
হবো নাতো।

ভাঙবো তোমার নিদ

মুসাফির আবদুল্লাহ

মহগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী,
কুরআনি রাজ কায়েম করা ফরয সবাই জানি।
আল-কুরআনের ডাকে সবাই বিলিয়ে দেবো প্রাণ,
আল্লাহর জন্য করতে পারি সবকিছু কুরবান।
আল্লাহর আইন করতে কায়েম বিশ্ব-ধরার মাঝে,
সারা জীবন করব লড়াই মুজাহিদের সাজে।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে করব যমিন লাল,
রবের বিধান চাই, নতুবা যুদ্ধ চিরকাল।
তাগুতের ঐ তোপ-কামানে পাই না কভু ভয়,
রবের পথে জীবন দিলে নেই তার কোনো ক্ষয়।
ওরে নবীন ছুটে এসো আল-কুরআনের ডাকে,
তাগুত মুক্ত করব আজ এই রবের যমিনটাকে।
রবের বিধান করতে কায়েম যাক আমাদের প্রাণ,
আমরা পাবো রবের কাছে শহিদি সম্মান।
মুসলিম ভূমি উন্নত শীর- ভূমিই মুজাহিদ,
জিহাদি গান গেয়ে আমি ভাঙবো তোমার নিদ।

প্রশ্নোত্তর?

প্রশ্ন (২/০৪) : কুরবানির পশু হারিয়ে গেলে কী করতে হবে?

-সিরাজুল ইসলাম

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যদি কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট পশু হারিয়ে যায়, তাহলে কুরবানিদাতাকে পুনরায় কুরবানির পশু ক্রয় করার প্রয়োজন নেই। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ثَمِيمِ بْنِ حُوَيْصٍ يَغْنَى الْمِصْرِيُّ قَالَ : لَسْتُ بِرَبِّ شَاةٍ بَيْنِي أَصْحَابُهُ فَضَلَّتْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا يَضُرُّكَ

তামীম ইবনে হুয়াইস মিসরি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় একটি ছাগল কুরবানি দেয়ার জন্য ক্রয় করি, কিন্তু তা হারিয়ে যায়। আমি সে সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সমস্যা নেই। (বাইহাকি সুনানে কুবরা, হা. ১৯৬৭০)

তবে যদি কুরবানিদাতা সামর্থবান হয় তাহলে ইচ্ছা করলে অন্য একটি পশু কুরবানি দিতে পারবে। কিন্তু এটা তার জন্য ওয়াজিব নয়।

আর যদি হারানো পশুটি কুরবানির দিনগুলোর মধ্যেই পেয়ে যায়, তাহলে সেটিকেই কুরবানি দিতে হবে। কিন্তু কুরবানির দিনগুলোর পরে পেলে বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন থাকবে। ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সাদাকাও করে দিতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন (২/০৫) : একই পশুতে একাধিক লোকের অংশগ্রহণে কুরবানি সহীহ হবে কি?

-রফিকুল ইসলাম

বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : সফর অবস্থায় একই কুরবানিতে

একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْعُقْرَةِ فَتَذْبِخُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْرِكُ فِيهَا

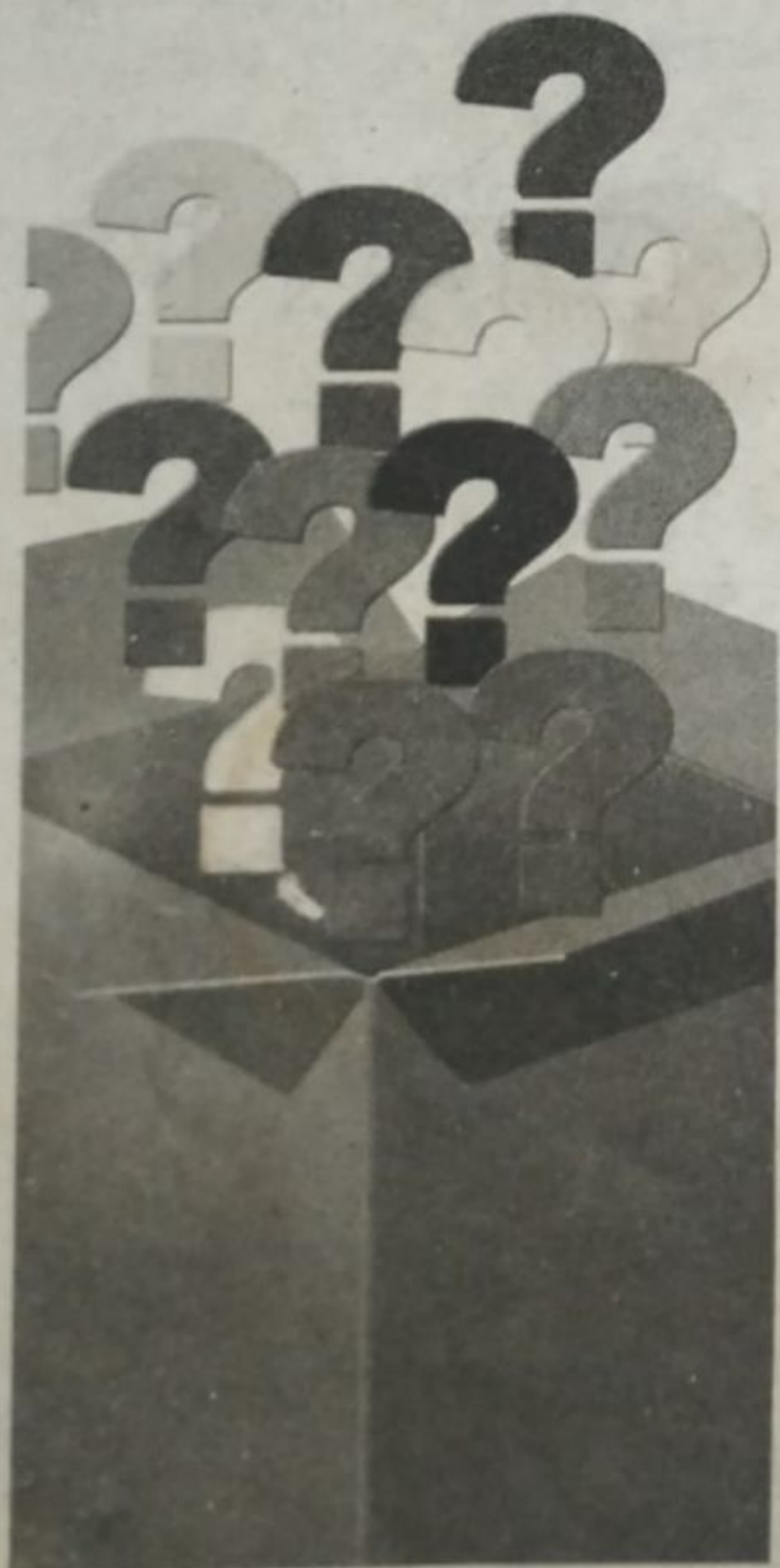
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে উমরা করতাম। তখন আমরা সাত শরীক মিলে একটি গরু কুরবানি করেছি। (সহীহ মুসলিম: ৩২৫২; আবু দাউদ: ২৮০৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৩০৪; সহীহ ইবনে খুযায়মা: ২৯০২; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ১০৪৯৩)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - فِي سَفَرٍ فَخَضَرَ الْأَصْحَى فَاشْرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সফরে ছিলাম। এমন সময় কুরবানির ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা গরুতে সাতজন এবং উটে দশজন শরীক হলাম। (তিরমিযি: ১৫০১; সহীহ ইবনে খুযায়মা: ২৯০৮; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪০০৭; মিশকাত: ১৪৬৯)

তবে মুকীম অবস্থায় একই কুরবানিতে একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না- এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ উপরের হাদীসগুলোকে সফরের সাথে খাস মনে করেন। সুতরাং তাদের মতে মুকীম থাকা অবস্থায় এ ধরনের কুরবানি বৈধ হবে না।

আবার অনেকে মনে করেন, বিষয়গুলো খাস বা আম হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) অথবা কোন সাহাবি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এ কারণে বিষয়টি আম তথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং সফর



অথবা মুকীম যে কোন অবস্থাতেই একই কুরবানিতে একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উত্তম হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি একাকি কুরবানি দেয়ার সামর্থ রাখে তাহলে সে একাকি কুরবানি দিবে। যদি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে একেকটি করে দিতে চায় তাহলে তাও করতে পারবে। আর যদি এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি করে তাহলে তাই যথেষ্ট হবে। যদিও একটি ছাগল অথবা ভেড়া হয়।

উপরের কোন অবস্থায় সক্ষম না হলে গরুর ক্ষেত্রে সাতজন এবং উটের ক্ষেত্রে দশজন অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, একাধিক পরিবারের পক্ষ থেকে একই কুরবানিতে অংশগ্রহণ করলে, যারা অংশগ্রহণ করবে কেবল তাদেরই কুরবানি হবে। বাকি সদস্যদের পক্ষ থেকে আদায় হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, একই কুরবানিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের নিয়ত খালিস হতে হবে এবং উপার্জন হালাল হতে হবে। অন্যথায় একজনের কারণে সকলের কুরবানি বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (২/০৬) : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে, ভাগে কুরবানির জন্তুতে সন্তানের আকীকা করা হয়। ভাবা হয় যে, আকীকার সাথে সাথে কুরবানিও আদায় হয়ে গেল! প্রশ্ন হলো একই জন্তুতে কুরবানি ও আকীকা চলবে কি?

-জাবির রাইহান

কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর : কুরআন-সুনাহর কোন দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেরীদের কেউই একটি গরু বা উটের সাত ভাগের কয়েক ভাগ কুরবানি এবং কয়েক ভাগ আকীকা দিয়েছেন। আকীকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরির বিধান দিয়েছেন। আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরির বিধান দিয়েছেন। আকীকাতে একটি প্রাণের মুক্তিপণে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণই শারঈ বিধান। অতএব এখানে যদি ভাগাভাগি হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই একই জন্তুর ভাগাভাগিতে কুরবানি এবং আকীকা

উভয়টি একসাথে জায়েয নয়। (তুহফাতুল মাওদুদ বিআহকামিল মাওলুদ পৃ.৪৭)

তবে ঈদুল আযহার দিনে কোন শিশুর সপ্তম দিন তথা আকীকার দিন হয় তার অভিভাবকের পক্ষ আকীকা ও কুরবানি উভয়ই দেয়া সম্ভব হলে দুটোই করবে। অন্যথায় একটি সম্ভব হলে কেবল আকীকা দেয়াই উত্তম। কেননা আকীকা সপ্তম দিনেই প্রদান করা সুন্নত। আর এটা জীবনে একবারই সুযোগ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু কুরবানির ক্ষেত্রে এক বছর প্রদান করতে অক্ষম হলে পরবর্তী বছর দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন (২/০৭) : মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েয আছে কি?

-খালিদ সাইদুল্লাহ

দশ মাইল, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা যাবে কি না- এ ব্যাপারে তিনটি অবস্থা রয়েছে।

১. মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে থাকে, তবে মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করা জরুরি। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেন,

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

এ বিধান শোনার পর যে ব্যক্তি তা (অসিয়ত) পরিবর্তন করবে, এর পাপ সেই পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (কুরআন, ২: ১৮১)

২. স্বাভাবিক অবস্থায় জীবিতদের সাথে মৃতদেরকে নিয়তে शामिल করে কুরবানি দেয়া যায়। যেমন- কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করল এবং পরিবার দ্বারা সে তার জীবিত ও মৃত সকলকে উদ্দেশ্য করল- এমনটি করা জায়েয। কেননা নবী (সা.) তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি দিতেন। অথচ তাঁর পরিবারের কেউ কেউ তাঁর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে কুরবানি করা সুন্নাতসম্মত নয়। কেননা নবী (সা.) খাস করে তাঁর কোন মৃত আত্মীয়ের পক্ষ থেকে কুরবানি করেননি। তাঁর চাচা হামযা (রা.) এর পক্ষ থেকেও না, অথচ তিনি তাঁর নিকট অত্যধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ঔরসজাত

সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকেও করেননি, যারা তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন তারা হলেন, তিনজন বিবাহিতা মেয়ে ও তিনজন ছোট ছেলে। এমনকি তিনি স্ত্রী খাদিজার পক্ষ থেকেও কুরবানি করেননি।

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন,

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضْحَى عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيُتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি না করে তার পক্ষ থেকে সাদাকা করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। তবে যদি কেউ (মৃতের পক্ষ থেকে) কুরবানি করে ফেলে তাহলে সে উক্ত কুরবানির পণ্ড থেকে কিছুই খাবে না; বরং পুরোটাই দান করে দিবে। (তিরমিযী: ১৪৯৫)

উল্লেখ্য যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করতে কোন সমস্যা নেই এবং মুসাফির ব্যক্তির জন্যও কুরবানি দেয়া বৈধ। কেননা নবী (সা.) হজের সফরে মিনায় নিজ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানি দিয়েছিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ৮৮১; সহীহ বুখারি: ৫৫৪৮; সহীহ মুসলিম: ২৯৮৩; মুসনাদে আহমাদ: ২৪১৫৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা: ২৯০৫; ইবনে মাজাহ: ২৯৮১; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩৯২৮; বাইহাকি সুনানে কুবরা: ৯০৩৮; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা: ২৫৬৬; শারহুস সুন্নাহ: ১৮৭৬)

প্রশ্ন (২/০৮) : মহিলারা কি ঈদের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

-সিরাজুল ইসলাম

চর আলেকজান্ডার, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : যে সমাজে জীবনের নিরাপত্তা নেই, যেমন- যুদ্ধবিধ্বস্ত সীমানা, ফিতনা বা পারস্পরিক দাঙ্গা কবলিত এলাকা ইত্যাদি ব্যতীত প্রশাসনিক সার্বিক নিরাপত্তা ও তাকওয়াশীল সমাজে নারীরা ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এমনকি শারীয়া আইনে এটাকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقُ وَالْخَيْضُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْخَيْضُ فَيُغْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيُشْهَدْنَ الْحَبْرَ وَذُغْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابٌ قَالَ لِيَلْبِسْهَا أُخْتًا مِنْ جَلْبَابِهَا

উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি

বালেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যেন আমরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঋতুবতী, সাবালিকা এবং শিশু নারীদেরকে নিয়ে বের হই। অতঃপর ঋতুবতী নারীরা সালাত আদায় করা হতে পৃথক থাকতেন। কিন্তু তারা অন্যান্য উত্তম কাজসমূহ ও মুসলিমদের দুআয় অংশগ্রহণ করতেন। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে এমন অনেক নারী আছে, যাদের কোন চাদর নেই। তখন তিনি বললেন, তাদের বোন যেন তাদেরকে চাদর ধার দেয়। (বুখারী: ৩২৪; মুসলিম: ২০৯৩; মুসনাদে আহমাদ: ২০৮১৮)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِنِسَاءِ مَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কন্যা ও স্ত্রীদেরকে দুই ঈদে বের হওয়ার অনুমতি দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৫৪; জামেউস সগীর: ৯০১৯; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব: ২১১৫)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَصَلِّ قُبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سَطْحَهَا

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তাঁর সাথে বিলাল (রা.) ছিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সাদকা করার আদেশ দেন। ফলে মহিলারা নিজ নিজ কানের রিং ও গলার হার সাদকা করতে লাগল। (মুসলিম: ২০৯৪; বায়হাকী: ৬০২০; আবু দাউদ: ১১৬১; মুসনাদে আহমাদ: ২৫৩৩; মুসনাদে শায্বানী: ১৪৩৬;)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّى نَخْرُجَ الْخُطْبُ فَيَكُونُ حُلْفُ الثَّالِثِ فَيَكْبِرُونَ بِكَبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ

উম্মে আতিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেয়া হতো। এমনকি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল হতে বের করতাম এবং ঋতুবতী

মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবিরের সাথে তাকবির বলতো ও তাদের দুআর সাথে দুআ করতো। আর তারা সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতার আশা করত। (বুখারী: ৯৭১)

উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাপ্তবয়স্ক, গৃহবাসিনী এবং ঋতুবতী মহিলাদেরকেও উভয় ঈদে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদেরকেও দুই ঈদে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আরো প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে এমনভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, যদি কোন মহিলার ওড়না বা চাদর নষ্ট থাকে তাহলে তাকে তার অপর বোনের চাদর ধার নিয়ে হলেও ঈদগাহে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ঋতুবতী মহিলারা নামাজের সময় নামায হতে বিরত থাকবে ও অন্যান্য কল্যাণকর কাজে ও মুসলিমদের দুআয় শরিক হবে। অপর হাদীসে এসেছে,

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ছিলাম। তিনি খুতবার আগে প্রথমে সালাত আদায় করলেন— আযান-ইকামাত ছাড়া। অতঃপর তিনি বিলাল (রা.) এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকওয়া অর্জন করার আদেশ করলেন ও তাঁর আনুগত্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর তিনি সমবেত জনতার সামনে উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করলেন। তারপর বক্তৃতা শেষ করে মহিলাদের কাছে গেলেন। অতঃপর তিনি তাদের সামনেও উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করলেন। তারপর বললেন, তোমরা সাদকা করো। কেননা তোমাদের বেশির ভাগ মহিলাই জাহান্নামের জ্বালানি হবে। (এ কথা শুনে) মহিলাদের মধ্য থেকে উভয় গালে কালো দাগ বিশিষ্ট একজন মহিলা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন— হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কেননা তোমরা বেশি বেশি অজুহাত ও অভিযোগ পেশ করে থাক এবং স্বামীর অবাধ্যাচরণ করে থাক। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহিলাগণ

তাদের অলঙ্কারাদি দান করতে শুরু করল। তারা তাদের কানের রিং এবং আংটিসমূহ বিলালের কাপড়ে ফেলতে লাগল। (মুসলিম: ২০৮৫; নাসাঈ: ১৫৭৫; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৪৬০; সুনানে দারেমি: ১৬১০; বায়হাকী: ৬০১৫)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের সালাত আদায় করে বিলাল (রা.)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গিয়েছেন। তাদেরকে দান সাদাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন, এমনকি মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওয়ায-নসীহত শ্রবণ করে তাদের কানের রিং ও গলার হার পর্যন্তও দান করে দিয়েছেন।

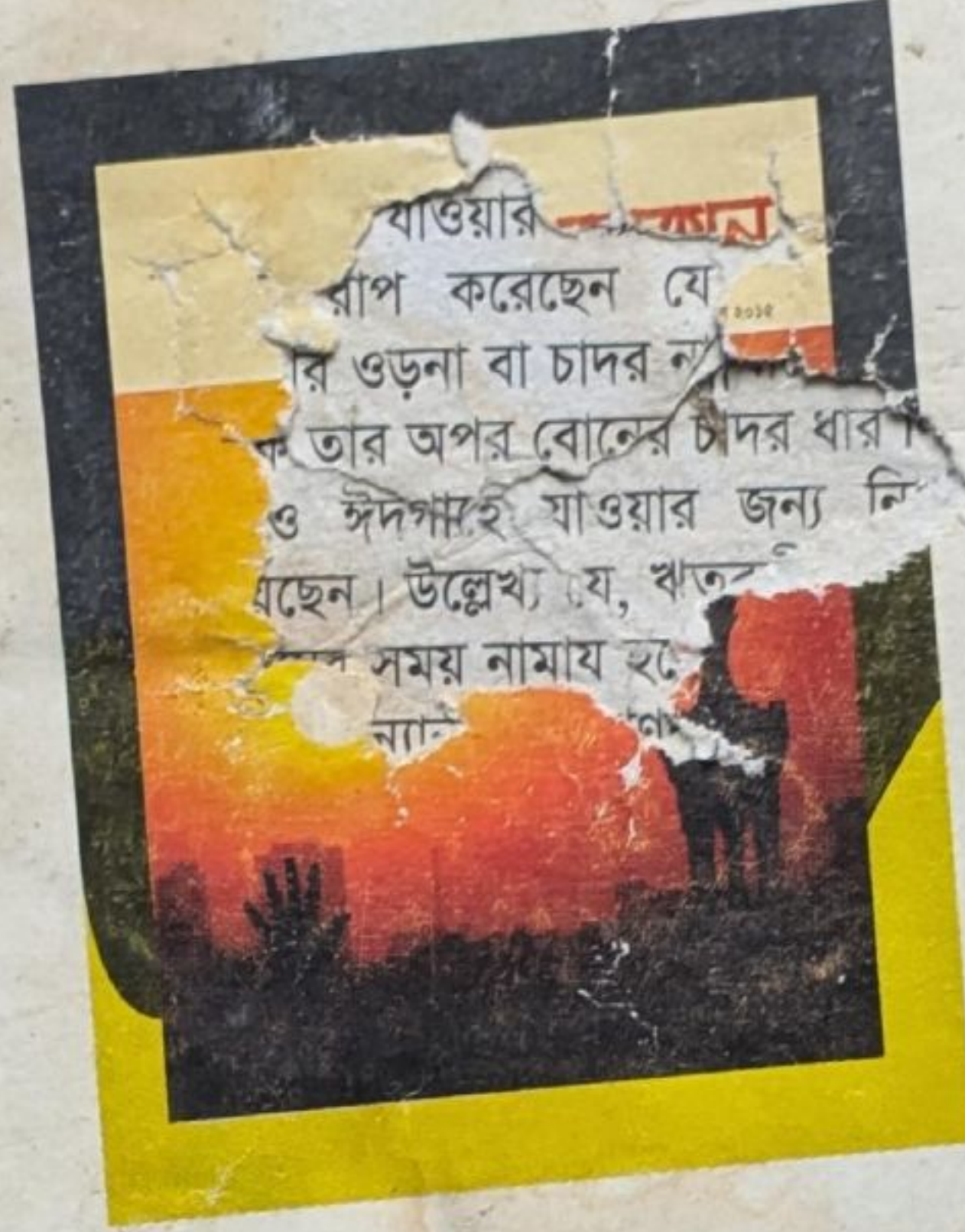
কিন্তু বড় অনুতাপের বিষয় হলো, মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে অনেক মুসলিমসমাজ মহিলাদেরকে মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া এবং মুসলিমদের দুআ, দীন শিক্ষা ও ওয়ায-নসীহত শ্রবণ করা নিষিদ্ধ মনে করেন। হ্যাঁ, বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যে কোনো বিবেকবান মানুষই স্বীকার করবেন যে, এখানে মানুষের জীবনধারণের নূন্যতম নিরাপত্তা নেই; তবুও যেখানে নিরাপত্তার পরিবেশ কয়েক করা সম্ভব হয়, সেখানে এ বিধান চলতে বাধা কোথায়? মোটকথা, সাধারণভাবে মহিলাদেরকে আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ও সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না বরং বিশেষভাবে সম্পূর্ণ শরিয়তসম্মত উপায়ে নিরাপদ পরিবেশে মহিলারাও ঈদের জামাআত ও খুতবায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

আপনার প্রশ্ন মেইল
করুন আমাদের
উত্তর দিবেন অভিজ্ঞ
মুফতিগণ

alburqan2015@gmail.com

মাসিক

আল যুরকান



পড়ুন

লিখুন

শরিক হোন
মুকাতিলীনদের
এই জামাআতে

প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও
যেকোন প্রয়োজনে

alburqan2015@gmail.com

www.facebook.com/alburqan